MRICHAKATIK

by Sudrak

Converted into novel

by Utpal Bhattacharya.

☐ প্রথম প্রকাশ : মে ১৯৫৯

☐ প্রকাশিকা : লতিকা সাহা। ১০/২এ, টেমারলেন, কলকাতা-৯

☐ মুদ্রাকর : শ্রীনিমাই চন্দ্র ঘোষ। দি রঘুনাথ প্রিন্টার্স

৪/১ই, বিডন রো, কলকাতা-৭০০০০৬

পরিচায়িকা

শূদ্রক রচিত সংস্কৃত সাহিত্যের ধ্রুপদী নাটক 'মৃচ্ছকটিক'কে বাংলা উপন্যাসে রূপান্তরিত ক'রে বিশিষ্ট সাহিত্যিক, বহুরূপীর খ্যাতনামা নট ও নাট্যকার উৎপল ভট্টাচার্য এক দুরূহ কর্তব্যকর্ম সম্পন্ন করলেন। সংস্কৃত সাহিত্যের কাব্য দর্শন নাটক উপন্যাস ইতোপূর্বেও অনূদিত হয়েছে। এমনকি বহু পূর্বে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর 'মৃচ্ছকটিক' নাটককে বাংলায় অনুবাদ করলেও উপন্যাস হিসেবে 'মৃচ্ছকটিক' নাটকের এরকম সাবলীল স্বচ্ছন্দ অনুবাদ আর হয়নি। নাট্যকার শূদ্রক তদানিন্তন যুগের নানা ঘটনাবলীর মাধ্যমে যে সব সামাজিক রাজনৈতিক ও মানবিক দিকগুলো তুলে ধরতে চেয়েছেন উৎপল ভট্টাচার্য শুধু সেইসব দিকগুলোই যথাযথভাবে তুলে ধরেননি পরন্তু এ যুগের মানসের পরি-প্রেক্ষিতে তাদের যথাযথ বিন্যাস করেছেন। শোষণ, বিদ্রোহ, সামাজিক শ্রেণী বিভাজন এ যুগের মত সে যুগেও যে অব্যাহত ছিল সেটা আমরা এই অনূদিত উপন্যাস থেকে বুঝতে পারি। প্রকৃতপক্ষে উৎপলবাবু শূদ্রকের মূল নাটকের আবেদন অক্ষুন্ন রেখে আধুনিক যুগের মানসিকতার সংমিশ্রণে একটি মৌলিক উপন্যাস রচনার স্বাদ পাঠকদের দিতে পেরেছেন বলা যায়।

আনুমানিক খৃঃ পূঃ ১ম শতক থেকে খৃষ্টাব্দ ৩য় শতকের মধ্যে নাট্যকার শূদ্রক জীবিত ছিলেন বলে মনে হয়। তাঁর সমসাময়িক সমাজ জীবনে বারবণিতারা যে সমাজে বিশেষ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিতা ছিলেন এবং তাঁরা যে অভিজাত সম্প্রদায়ের মানুষকে বিয়ে করে গৃহবধূর জীবন যাপন করতে পারতেন 'মৃচ্ছকটিক' নাটকের নিম্নোক্ত শ্লোকে তার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়—

অবন্তি পুর্য্যাং দ্বিজ সার্থবাহ
নাম্না দরিদ্র কিল চারুদত্ত।
গুণানুরক্তা গণিকা চ তস্য
বসন্তসেনেব বসন্তসেনা॥

অর্থাৎ অবন্তিপুরে চারুদত্ত নামে এক গরিব (ব্রাহ্মণ) সার্থবাহ (বাণিজ্যকারী দলের নেতা) ছিলেন। বসন্তকালের মতই সুন্দরী গণিকা বসন্তসেনা তাঁর (চারুদত্তের) গুণে বশীভূত হয়েছিলেন। এই বারবণিতা বসন্তসেনাই হলেন 'মৃচ্ছকটিক' নাটকের মূল নায়িকা। একদিকে যেমন বসন্তসেনা ও চারুদত্তের প্রেমকাহিনীর রোমান্টিক চটুটি অক্ষুন্ন রেখে এ যুগের পাঠকদের কাছে তাকে

আকর্ষণীয় ক'রে তুলতে পেরেছেন অনুবাদক তেমনি অন্যদিকে সহ-নায়ক নায়িকার (শর্বিলক ও মদনিকা) প্রেমোপাখ্যান পাঠকদের কাছে যথেষ্ট উপভোগ্য হয়ে উঠেছে।

ভারতীয় সাহিত্যে সর্বপ্রথম বোধহয় 'মৃচ্ছকটিক' নাটকে অত্যাচারী রাজার বিরুদ্ধে অত্যাচারিত সাধারণ প্রজাদের (Commoner) বিদ্রোহ স্থান পেয়েছে। আর্যক সর্বহারার প্রতিভূ হয়ে শোষক রাজার বিরুদ্ধে শোষিত প্রজাদের জন্যে বিপ্লব সংঘটিত ক'রে নতুন যুগের সূচনা করেছে। সে যুগের পটভূমিকায় নাটকের সৃষ্টি হলেও নাটকের মৃচ্ছকটিক (মাটির খেলনা) নামকরণের মাধ্যমে শূদ্রক সর্বকালীন মানুষের লোভ ঘৃণা ভালবাসা বঞ্চনার কাহিনী বলেছেন। রাজা, রাজার শ্যালক শকার, বিচারকদ্বয় ও অন্যান্য চরিত্রের রূপায়ণ নাটকের নামকরণের সার্থকতাই প্রমাণ করে। পরিশেষে এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে উৎপল ভট্টাচার্য কৃত বাংলা উপন্যাসে রূপান্তরিত সংস্কৃত নাটক 'মৃচ্ছকটিক' বাংলা সাহিত্যে এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

পি/৩৩, জ্যোতিষ রায় রোড,
কলিকাতা-৭০০০৫৩

[মানব বন্দ্যোপাধ্যায়]

এ যুগের অনন্য নাট্য-ব্যক্তিত্ব
কুমার রায়
শ্রদ্ধাভাজনেষু



অন্ধকার রাজপথ। ঘোর অন্ধকার রাত্রি। বুঝি বা সমগ্র উজ্জয়িনী নগরী ঢ'লে পড়েছে নিদ্রার শীতল ক্রোড়ে। প্রশস্ত রাজপথ জনহীন। দুপাশের পথ-দীপিকাগুলি থেকে যে সামান্য আলোকচ্ছটা বিচ্ছুরিত হচ্ছে, তাতে অন্ধকার কেটেছে সামান্যই।

দ্রুতপায়ে বসন্তসেনা এগিয়ে যাচ্ছিল গৃহের দিকে। আজ কামদেবের মন্দিরে পূজার্চনা সারতে বেশ দেরীই হয়ে গেছে। দেরী হবার আরও কারণ—চারুদত্ত! চারুদত্তের সঙ্গে আজই প্রথম মুখোমুখি সাক্ষাৎকার বসন্তসেনার। উজ্জয়িনীর একদা বণিকশ্রেষ্ঠ চারুদত্তের নাম অজানা নয় বসন্তসেনার। চলার পথে দু'একবার সে দেখেনি চারুদত্তকে এমনও নয়। কিন্তু আজকের দেখা—দেখা নয়, সাক্ষাৎ। এই সাক্ষাৎ গভীর তাৎপর্যময়! অন্ততঃ বসন্তসেনার কাছে! বলতে গেলে, সমস্ত পৃথিবীটাই আজ ওলট পালট হ'য়ে গেছে বসন্তসেনার! কামদেবের আরাধনায় তন্ময় হ'য়ে নৃত্যের মাঝে সহসা সেই দুটি মুগ্ধ আঁখির সঙ্গে তার দৃষ্টির সংযোগ! নৃত্যের মাঝেই থেমে যেতে হয়েছিল বসন্তসেনাকে। ক্ষণেকের জন্য হলেও উজ্জয়িনীর সমাগত রসিক নাগরিকবৃন্দের কেউ কেউ তা অবশ্যই লক্ষ্য করে থাকবেন। তাতে অবশ্য বসন্তসেনার ভয় পাবার কিছু নেই। উজ্জয়িনী নগরীর নটীশ্রেষ্ঠা সেজন্য এতটুকুও কুণ্ঠিত নয়। কিন্তু প্রশ্ন তা নয়। প্রশ্ন আজ নিজেকেই, নিজের মনকে। একি হ'লো আজ তার! বহুজনবল্লভা নটী সে। কত শত শ্রেষ্ঠ পুরুষেরা তার পায়ের নীচে গড়াগড়ি যায়! নৃত্যের আসরে

মগুপানে বিভোর, নেশাগ্রস্ত ঐসব শ্রেষ্ঠ, ধনী, রূপবান পুরুষদের বরং সে তাচ্ছিল্য আর ঘৃণার দৃষ্টিতেই দেখে। এমন কি তার প্রাপ্য দানও সে ঐ সমস্ত পুরুষদের কাছ থেকে স্বহস্তে গ্রহণ করে না। নেশায় আচ্ছন্ন ওই সমস্ত পুরুষেরা যখন আসরের মেঝেতেই শুয়ে পড়ে আকুলি বিকুলি ক'রে বসন্তসেনার অলক্তক রঞ্জিত পায়ের দিকে এগোতে চেষ্টা করে, বসন্তসেনা ততক্ষণে আসর ছেড়ে অন্তঃপুরের দিকে চলে যায়। তখন তার দাসদাসীরাই সেইসব লম্পট রাজ-পুরুষ বা বণিকপুরুষদের কাছ থেকে বসন্তসেনার প্রাপ্য মুদ্রা বা উপহারগুলি সংগ্রহ করে নেয়; সাধ্যমত তাদের পরিচর্যা করে, এবং যথাসময়ে তাদের স্ব স্ব গৃহের দিকে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থাও করে দেয়। কাজেই, বসন্তসেনার আর যাই হোক, পুরুষ সম্পর্কে কোনও প্রকার দুর্বলতাই নেই। অন্ততঃ আজ কামদেবের মন্দিরে, সেই স্বর্গীয় মুহূর্তের পূর্ব পর্য্যন্ত, এই ধারণাই ছিল বসন্তসেনার। কিন্তু, তারপর?

এরই নাম কি অনুরাগ? প্রেম? বুঝি তাই। না হলে এই মুহূর্তেও সেই পুণ্য দৃষ্টিসংযোগ স্মরণ করে কেন তার দেহ বল্লরী ক্ষণে ক্ষণে কেঁপে উঠছে! কেন, এক অজানা বিহ্বল হর্ষে মন-প্রাণ ভেসে যেতে চাইছে! দেহের পরতে পরতে কেন স্বেদধারা বহে যাচ্ছে! সে কি দয়িতের সঙ্গে মিলন আকাঙ্খায়? কিন্তু—

সহসা কে যেন তার নাম ধরে ডাকতেই চমকে মুখ ফেরালো বসন্তসেনা। অন্ধকারে কিছুই ঠাহর হলো না। কিন্তু স্পষ্টতঃই বুঝতে পারল দু'তিন জন দ্রুত পদক্ষেপে তারই দিকে এগিয়ে আসছে তবে কি তার সঙ্গের দাসীরা! পিছিয়ে পড়েছিল বলে তাড়াতাড়ি দৌড়ে আসছে? কিন্তু না! এমন ভারী পায়ের শব্দ তো তার দাসীদের হবার কথা নয়। তাহলে?

আবার কে তার নাম ধরে ডাকল, 'বসন্তসেনা! একটু দাঁড়াও গো দাঁড়িয়ে যাও! বেশ তো মৃদুল চরণে নেচে নেচে যাচ্ছিলে। এখন আবার দৌড়চ্ছো কেন? তোমাকে কি ব্যাধ তাড়া করেছে যে

সচকিতা হরিণীর মত উদ্বিগ্ন হয়ে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে পালিয়ে যাচ্ছো ?'

এমনভাবে কে কথা বলছে ? বসন্তসেনা দ্রুত পায়ে চলতে চলতে ভেবেও ঠিক করতে পারল না। পরক্ষণেই আর একজনের ডাক শুনতে পেল সে।

'দাঁড়াও গো বসন্তসেনা, একটু দাঁড়াও। এমন স্খলিত চরণে চরণে কোথায় পালাচ্ছো বালা ? মাথা খাও। একটু দাঁড়িয়ে যাও, সখী। ভয় পেও না। তোমাকে খেয়ে ফেলব না। কামের আগুনে আমার বুক পুড়ে যাচ্ছে; যেমন গল্‌গলে আগুনের মধ্যে মাংসখণ্ড পড়লে পুড়ে যায়, তেমনি।'

এবার গলাটা চিনতে কোনও অসুবিধে হল না বসন্তসেনার। সর্বনাশ ! এ যে রাজার শ্যালক শকারের গলা ! ওর মত হাড়বজ্জাত সারা দেশে আর একজনও নেই। রাজার শালা বলে দম্ভে মাটিতে পা পড়ে না। ওর একটা বিরাট দল আছে। যাদের নিয়ে ও সবরকম কুকর্ম করে বেড়ায়। দোকানপাট থেকে জোর করে অর্থ আদায় করে। স্বার্থান্বেষী লোকদের কাছ থেকে প্রচুর উৎকোচ নিয়ে অন্যায়ভাবে নিরীহ নাগরিকদের ওপর অত্যাচার উৎপীড়ন চালায়। এমন কি বিবিধ রাজকার্যেও বাধা সৃষ্টি করে। রাজপুরুষদের ভীতি প্রদর্শন করে অন্যায় কাজ করতে বাধ্য করে। আর এ সমস্তই দেশের রক্ষক, অপদার্থ রাজা পালক নির্বিবাদে সয়ে যান। রাজকুল রক্ষী বা নগররক্ষীরাও ভয়ে কিছু বলে না। কোন নাগরিকের গৃহে সুন্দরী মেয়ে দেখলে তার আর রেহাই নেই এই নরপশুর হাত থেকে। এই লোকটার সর্বক্ষণের সঙ্গী একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত যুবক। রাজা পালক এঁকে শ্যালকের শিক্ষক রূপে নিয়োজিত করেছেন। কিন্তু পণ্ডিতের সাধ্য কি এই নরপশুকে মানুষ করে তোলেন বা সুশিক্ষা দেন। বরং এমন লোভনীয় বেতনের কর্মটি টিকিয়ে রাখার জন্যে বজ্জাত শিষ্যটির দোসর হয়ে পড়েছেন নিজেই। এবার বুঝতে পারল বসন্তসেনা। প্রথমবারে ঐ পণ্ডিতই তাকে

ডেকেছিল।

সে যাক। কিন্তু, এখন উপায়! দাস দাসীদেরও তো ধারে কাছে দেখতে পাচ্ছে না বসন্তসেনা। তবু চাপা গলায় ডেকে উঠল, 'ও পল্লবক, পল্লবক! কোথায় গেলি তোরা! ওলো পরভৃতিকে, পরভৃতিকে!'

বসন্তসেনার গলা শুনে শকার একটু ভয় পেয়ে গেল যেন। বলে উঠল, 'ও পণ্ডিত। ওর সঙ্গে লোকজন আছে দেখছি!'

বসন্তসেনা আবার ডাকল, 'মাধবীকে! ও মাধবীকে! কোথায় চলে গেলি তোরা?'

এবার পণ্ডিত হেসে শকারকে বলল, 'ধুর মুর্খ! বসন্তসেনা তো পরিচারিকাদের ডাকছে।'

'ও! তাই বল! স্ত্রীলোকদের ডাকছে!' শকার যেন কিছুটা আশ্বস্ত হলো!—'একশ জন স্ত্রীলোককে ডাকুক্ না। মেরে সব বেটিকে খেদিয়ে দেবো! ওরা তো জানে না যে আমি কতবড় একজন বীর। কি বল, পণ্ডিত?'

বসন্তসেনা তখন দ্রুত ভেবে চলেছে। তার লোকজনেরা যে কারণেই হোক, সবাই পিছিয়ে পড়েছে। কিন্তু ভয় পেলে চলবে না। বরং রুখে দাঁড়াতে হবে—হবেই। নইলে এই লোভী, লম্পট নরদানবটার হাতে তার সমূহ সর্বনাশ! এমনিতেও শকারের যে রাগ আছে, লোভ আছে তার ওপর, বসন্তসেনা তা জানে। সে নগরনটী বলে৹ শকার বারবার তার নৃত্যগীতের আসরে যোগ দিতে চেয়েছে; পদমর্যাদার শক্তি প্রয়োগ করতে চেয়েছে, ভোগ করতে চেয়েছে বসন্তসেনাকে। কিন্তু বসন্তসেনা প্রতিবারই শকারকে তাড়িয়ে দিয়েছে। এবং এই একটি ব্যাপারে রাজা পালক শ্যালককে প্রশ্রয় দেননি। বরং বসন্তসেনার অভিযোগে শ্যালককে ডেকে ধম্‌কে দিয়েছেন। আজ বুঝি তাই স্মরতোৎসবের রাত্রে সুযোগ বুঝে তার পিছু নিয়েছে শকার। তা হোক। এখন নিজেকে নিজেই রক্ষা করা ছাড়া আর গত্যন্তর নেই। ফিরে দাঁড়ালো বসন্তসেনা।

শকার তখন চেঁচিয়ে বলল, 'ডাকো, ডাকো, বসন্তসেনা, তোমার পল্লবককে ডাকো, পরভৃতিকাকে ডাকো—সমস্ত বসন্ত ঋতুকেই ডাকো না কেন—আমি তোমাকে তাড়া করে ধরবই ধরব। দেখি কে তোমাকে রক্ষা করে। সুতীক্ষ্ণ অসির ঘায়ে এক্ষুনি তোর মুণ্ডুটা দুখানা করে ফেলব। কোথায় পালিয়ে বাঁচবি। আমার হাতেই তোর নিশ্চিত মরণ!'

বসন্তসেনা ভয় পেয়ে বলে উঠল, 'মহাশয় আমি অবলা রমণী।'

পণ্ডিত হেসে বলে উঠল, 'তাই তোমার রক্ষে।'

শকারও একগাল হেসে বলল, 'সে জন্যেই আজ বেঁচে গেলে।'

কিন্তু ওদের এই আপাত আশ্বাস বাক্যেও বসন্তসেনার ভয় কাটলো না।

যা হয় হবে। এই ভেবে সে বলে উঠল, 'মহাশয়! আপনি কি আমার অলঙ্কারগুলি চান?'

এবারও পণ্ডিতই একহাত জিভকেটে প্রথমেই বলে উঠল: 'আরে, ছি, ছি! সে কি কথা! উদ্যান লতা থেকে ফুল কি কেউ কখনো ছিঁড়ে নেয়। তোমার ওইসব অলঙ্কার দিয়ে তো আমাদের কোন প্রয়োজন মিটবে না।'

বসন্তসেনা এবার সত্যিই ভয়ে ভয়ে বলল, 'তবে আপনারা কি চান এখন?'

শকার উৎসাহে উৎফুল্ল হয়ে আন্দাজেই বসন্তসেনার প্রায় কাছাকাছি এসে বলল, 'আমি দেবপুরুষ, আমি মনুষ্যকুলে স্বয়ং বাসুদেব! আমি তোমার ভালবাসা চাই, সখী।'

শুনতে শুনতেই দু'কানে আঙুল গুঁজে বন্ধ করে দিয়েছিল বসন্তসেনা। এবার ধমকে উঠল, 'থামুন! আর না!'

আহ্লাদে একেবারে আটখানা হয়ে হাতে তালি দিয়ে উঠল শকার। 'ও পণ্ডিত, পণ্ডিত! দেখ, দেখ! আমার ওপর মমতা করে বসন্তসেনা সখী কি বলছে শোনো। বলছে, 'থামো গো, আর বলতে হবে না গো, এখানে এসো, আমার কাছে বসো, তুমি কত

শ্রান্ত হয়েছো, কত ক্লান্ত হয়েছো।—বলি ও ঠাকরুণ! তোমার দিব্যি, আমি কোথাও যাইনি গো! গ্রামের বাইরেও না, নগরের বাইরেও না। আমি যে তোমার পিছনে পিছনে ছুটেই শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে পড়েছি গো।'

পণ্ডিত বসন্তসেনার ধমক্ ঠিকই শুনতে পেয়েছিল। মনে মনে হেসে বলল, 'মুখ্যুটার কথা শোনো! বসন্তসেনা শুধু বলেছে, 'থামো, আর না', আর এই ব্যাটা হস্তী মুর্খ মনে করেছে, বসন্তসেনা ওকে আদর করে কথাগুলো বলেছে! ওফ! কি পাঁঠাকেই যে পাঠ শেখাতে হচ্ছে আমার! তাও যদি নিরেট মাথায় কিছু ঢুকত। যা হোক। এখানে তো আর শকারের বিরুদ্ধাচারণ করা চলবে না। তাই গলা খাঁকারি দিয়ে প্রকাশ্যে বলল, 'বসন্তসেনা! এটা তুমি কেমন কথা বললে? নটীর গৃহ তো যুবকদেরই আশ্রয়স্থান। গণিকা হল গিয়ে পথের ধারে জন্মানো লতার মত। উপযুক্ত ধনের বিনিময়ে বিক্রেতা যেমন শত্রুমিত্র সকলকেই পণ্য বিক্রয় করতে বাধ্য, তেমনি গণিকাও প্রিয় অপ্রিয় সকলকেই সমভাবে সেবা করতে বাধ্য। দীঘিতে যেমন ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ, বিজ্ঞ বা মুর্খ সকলেরই স্নান করার অধিকার; নৌকাতে যেমন পারাপার হবার অধিকার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সকলেরই, তেমনই গণিকাও সকলের সেবা করবে অনুরাগের সঙ্গে! তাই না?'

বসন্তসেনা স্পষ্ট করে, দৃঢ়স্বরে পণ্ডিতের কথার উত্তর দিল, 'গুণই অনুরাগের কারণ। বলপ্রয়োগে অনুরাগ জন্মে না!'

বসন্তসেনার কথা শুনে শকার তো রেগে উঠল গর্জে, 'বুঝলে পণ্ডিত! এই গর্ভদাসীটা, ওই যে কামদেবের মন্দিরে, সেই হতভাগা দরিদ্র চারুদত্তের চোখে চোখ চেয়ে কত ঢঙ করছিল, তোমাকে বললাম না তখন, বুঝেছিলাম সেই সময়েই। এই বেটি এখন ওই হতভাগার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে! এখন বুঝি তাই চারুদত্তের গৃহের দিকেই চলেছে। ওই বেটার গৃহ তো খুব কাছেই। তাই না! সারারাত ধরে ফষ্টিনষ্টি চালাবে! কিন্তু, আমিও রাজার শ্যালক শকার।

পালিয়ে যেতে তোমাকে দিচ্ছি না, সখী। পণ্ডিত! দেখো, কিছুতেই যেন আমাদের হাতছাড়া না হয়।'

বেচারি ভালোমানুষ পণ্ডিতের এখন উভয় সঙ্কট। মনে মনে শকারকে সে গালাগাল দিল। বেটা কি মুখ্যু দেখ! যে কথাটা চেপে চাওয়া দরকার, সে কথাটাই চেঁচিয়ে জানিয়ে দিল। চারুদত্তের গৃহ যে নিকটে, সেটাই জানিয়ে দিল বসন্তসেনাকে। তাতে তো বসন্তসেনার সুবিধেই হল। সে চারুদত্ত মহাশয়ের প্রতি অনুরক্তা। তা তো হবেই। রত্ন তো রত্নের সঙ্গেই মেশে। বসন্তসেনা নটী হলেও নিঃসন্দেহে নারীরত্ন। যে কোনও পুরুষেরই আকাঙ্খিত ধন। পণ্ডিত তাই চাপা স্বরে বসন্তসেনাকে সতর্ক করে দিল। 'বসন্তসেনা! এইবেলা পালাও! তাহলে মুর্খটার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে।'

তারপর গলা তুলে চেঁচিয়ে বলল, 'দেখ শকার, অতি নিকটেই সেই বণিক চারুদত্তের গৃহ। তুমি ঠিকই বলেছ।'

'হুঁহুঁহুঁ ব্বাবা! আমাকে ফাঁকি দেওয়া অত সহজ নয়, সখী!' আত্মপ্রসাদের হাসি হাসল শকার, 'ঠিক ধরেছি। ওই চারুদত্তের গৃহের দিকেই যাচ্ছে বসন্তসেনা। পণ্ডিত! সতর্ক থেকো।'

ওদিকে বসন্তসেনা তখন পেছু হটতে হটতে একটি প্রাচীরের গায়ে ধাক্কা খেল অন্ধকারের মধ্যে। ফিরে, প্রাচীরের গায়ে হাত বুলিয়ে বুঝতে পারল কারো গৃহের সীমানায় এসে পড়েছে সে। এই তবে চারুদত্তের গৃহের সীমানা প্রাচীর! মনে মনে ইষ্ট-দেবতাকে প্রণাম জানালো বসন্তসেনা। এত কাছে এসেও কি বিস্মরণ! একটুও মনে পড়ে নি যে এত নিকটেই চারুদত্তের গৃহ। ওই দুষ্ট শকারটা হঠাৎ এসে উপদ্রব ঘটাতেই তার এই বিস্মরণ! তবু ভাগ্য, এই শয়তান, দুষ্ট লোকটা মন্দ করতে গিয়েও আমার উপকারই করলে, আমার প্রিয়জনের সঙ্গে মিলন ঘটিয়ে দিলে।

শকার আর পণ্ডিত তখন সামান্য দিকভ্রষ্ট হয়ে, অন্ধকারের মধ্যেই, বসন্তসেনাকে খুঁজছে। শকারের কথাগুলো বেশ স্পষ্টই

শুনতে পাচ্ছে বসন্তসেনা। বেচারা খুব হতাশ হয়ে পড়েছে। ধরতে পারছে না তো বসন্তসেনাকে।—

'ও পণ্ডিত! খড়ের গাদায় ছুঁচের মত এই অন্ধকারের মধ্যে বসন্তসেনা কোথায় মিলিয়ে গেল যে। হায়! হায়! সব গেল আমার!

পণ্ডিত বলে উঠল, 'কি করবে বল! ভয়ানক অন্ধকার যে। এক হাত দূরের জিনিষও দেখা যায় না। চোখ চেয়েই আছি। তবু মনে হচ্ছে যেন অন্ধ হয়ে আছি।'

'তা হোক, পণ্ডিত।' শকার বললে, 'আমি ফের একবার খুঁজে দেখি বসন্তসেনাকে।'

'তা দেখ!' পণ্ডিত বললে, 'কিন্তু তার আগে বল তো, কোন কিছু চিহ্ন কি তোমার লক্ষ্য হচ্ছে?'

'কি? কি চিহ্ন বলতো, পণ্ডিত?'

এই যেমন ধর—ভূষণের শব্দ, নারী অঙ্গের মধুর সৌরভ, বা মালার গন্ধ?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক বলেছ পণ্ডিত।' শকার উৎসাহে উৎফুল্ল হয়ে বলতে লাগল: 'মালার গন্ধ তো আমি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি! অন্ধকারে আমার নাক একেবারে ভরে গেচে। কিন্তু, কই, ভূষণের শব্দ তো একটুও দেখতে পাচ্ছি না?'

শকারের উদ্ভট কথা শুনে পণ্ডিত তো মনে মনে হেসে আকুল হ'ল। তারপর বলল, 'শকার! তুমি তোমার বাঁ দিকটা ধরে এগিয়ে যাও! তাহলেই ভূষণের শব্দ দেখতে পাবে। গেছো?'

অন্ধকারের ভেতর থেকেই উত্তর এল, 'এই যে যাচ্ছি!'

পায়ের শব্দে শকার দূরে চলে গেছে অনুমান করে চাপা গলায় পণ্ডিত বসন্তসেনার উদ্দেশ্যে বলল: 'বসন্তসেনা! অন্ধকারে তোমাকে দেখা যাচ্ছে না। মেঘের আড়ালে চাঁদের মত তুমি লুকিয়ে পড়েছ ঠিকই। কিন্তু তোমার গলার সুগন্ধি ফুলমালার সৌরভ যে বাতাসে ভেসে আসছে! তোমার হাতের কঙ্কণ আর পায়ের

নূপুরের শব্দও তো শোনা যাচ্ছে। তুমি তো যে কোনও মুহূর্তে ধরা পড়ে যাবে। মালাটা খুলে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দাও। আর কঙ্কন-নূপুর খুলে ফেলে আঁচলে বেঁধে নাও। বুঝেছ! শুনতে পাচ্ছ আমার কথা?'

বসন্তসেনা শুনতে পেয়েছে। চাপা স্বরে সে বলল,—'শুনেছি, পণ্ডিত মশাই, বুঝেওছি।' বলে গলা থেকে মালা খুলে নিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। লাল চেলি-কাপড়ের কটিবন্ধনী খুলে গয়না-গুলো তাতে বেঁধে নিল। তারপর প্রাচীর ধরে একদিকে এগুতে এগুতে একটা দরজায় হাত পড়ল। বুঝতে পারল বসন্তসেনা এটা নিশ্চয়ই খিড়কি-দরজা। কিন্তু ভেতর থেকে বন্ধ যে! এখন উপায়! ওদিকে গলার স্বরে বুঝতে পারল যে শকার শয়তানটা আবার এদিকেই ফিরে আসছে। কি সর্বনাশ! এবার আর রেহাই নেই।



চারুদত্তের বয়স্য, মৈত্রেয় কিছুটা ব্যস্ত সমস্ত ভাবেই চারুদত্তের গৃহ-অঙ্গনে প্রবেশ করলো। চারুদত্ত তাকে দেখে সহাস্যে আহ্বান জানালেন, 'এস সখা।'

'এত তাড়া কিসের? ব্যস্ত সমস্ত হয়ে কোত্থেকে এলে?'

'বলছি, বলছি। মৈত্রেয় আসন পিঁড়ি হয়ে দাওয়ার এক কোণে বসে বলল, 'সখা। তোমার দেবকার্য কি শেষ হয়েছে?'

'না। এখনও সব হয়নি। কেন বল দিকি?'

গলা উঁচিয়ে চারপাশটা একবার ভাল করে দেখে নিয়ে গলা নামিয়ে মৈত্রেয় বলল, 'দেখ সখা! তোমার প্রিয় বয়স্য—চূর্ণবৃদ্ধ জাতী-ফুলের গন্ধে ভরপুর এই চাদরটি পাঠিয়েছেন, আর বলে দিয়েছেন, দেবকার্য শেষ হয়ে গেলে চারুদত্তকে এইটি দেবে।' বলে চাদরটা বগলের নীচ থেকে বার করে চারুদত্তের হাতে দিল।

চারুদত্ত কিঞ্চিৎ বিস্ময় চকিত হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'চূর্ণবৃদ্ধ? তার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হয়েছে? সে নিরাপদেই আছে তো! রাজার চরেরা তো তাঁকে ধরবার জন্য—'

চারুদত্তকে বাধা দিয়ে মৈত্রেয় বলল, 'ওহে, অত চিন্তিত হয়ো না। সে নিরাপদেই আছে এবং সংগঠনের কাজকর্মও ঠিকমত চালিয়ে যাচ্ছে।'

যাক। তোমার কথা শুনে নিশ্চিন্ত হলাম। ওরা নিরাপদে থাক, এই আমার নিরন্তর কামনা। চারুদত্ত শান্ত হয়ে বললেন। 'মৈত্রেয়! গৃহদেবতাদের পূজা আমার শেষ হয়েছে। এখন তুমি রাজপথের চৌমাথায় গিয়ে মাতৃকাগণের পূজা দিয়ে এস!'

মৈত্রেয় প্রবলভাবে মাথা নেড়ে বলল, 'না সখা, আমি যাব না।'

'কেন ? তোমার আবার কি হ'ল ?'

'না, না, এত পুজা-আর্চা করেও যখন দেবতারা তোমার প্রতি প্রসন্ন হলেন না—তখন দেবতাদের পূজা দিয়ে কি ফল ?'

'ওভাবে বলো না, সখা।' চারুদত্ত সহজ কণ্ঠে বললেন, 'এটি যে গৃহস্থের নিত্য-কর্তব্য-কর্ম। ফলাফল বিচারের ভার তো আমাদের উপরে নয়, মৈত্রেয়। যাও। মাতৃগণের পূজা দিয়ে এসো।'

কিন্তু মৈত্রেয় রাজী হয় না। খানিকটা ক্ষোভের স্বরেই যেন বলে, 'না হে না, আমি যাচ্ছি না। আর কেউ গিয়ে পূজা দিয়ে আসুক। আমিও তো এক হতভাগ্য ব্রাহ্মণ। তোমারই দৌলতে নানাবিধ ব্যঞ্জন পাত্রে পরিবৃত হয়ে কি ভুঁড়িভোজই না করেছি। অহোরাত্র সুগন্ধ মোদক আহার করে উদ্গার তুলেছি। আর আজ। যেখানে সেখানে চরে বেড়িয়ে ঘোরো-কবুতরের মত গৃহে ফিরে আসছি। সখা! আমার মত ব্রাহ্মণের সকলি বিপরীত ফল ফলে। আর্শির ভিতরকার ছায়ার মত বাম দিক ডান আর ডান দিক বাম হয়ে যায়। তাছাড়া এই রাতের বেলা রাজপথে বেশ্যা, ধূর্ত, লম্পট, নীচ জাতীয় দাস, রাজার প্রিয়-পাত্র এরা সব বেড়িয়ে বেড়ায়। তাই বলছি, ব্যাঙের লোভে কালসাপের মুখে ইঁদুর পড়লে যেমন হয়, এদের হাতে পড়লে আমারও প্রাণটা সেইরকম যাবে। না, না! তুমি অন্য কাউকে পাঠাও।'

মৈত্রেয়র কথা শুনে, চারুদত্তের বুক ভেঙ্গে যেন একটা দীর্ঘশ্বাস নির্গত হল। কতকটা আপন মনেই যেন তিনি বলে উঠলেন, 'অর্থ চিন্তায় আমি আকুল হই না কখনও। ভাগ্যবশে ধন আসে, ধন যায়। শুধু দুঃখ এই যে নষ্ট হলে ধন, লোকের শিথিল হয় সৌহার্দ-বন্ধন।'

সখা চারুদত্তের মুখে এই কথা শুনে মৈত্রেয় একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়ল। তাড়াতাড়ি বলে উঠল: 'আচ্ছা সখা। যদি আমাকে যেতেই হয়, তবে রদনিকাও আমার সঙ্গে চলুক। আমার সহায়

হ'য়ে?'

চারুদত্তের বিশাল ব্যবসায় নষ্ট হয়ে গেলে, এবং অপরিমিত দান ধ্যান করে একেবারে নিঃসম্বল, কপর্দকহীন হয়ে যাওয়ার পর একে একে বন্ধু-বান্ধব, দাস-দাসী, আশ্রিত আত্মীয়-পরিজন সকলেই তাঁকে ছেড়ে গেছে। কেবল মৈত্রেয় এবং দাসী রদনিকা যায় নি। সেই একমাত্র দাসী রদনিকাকেই ডাক দিলেন চারুদত্ত। 'রদনিকে! তুমি মৈত্রেয়র সঙ্গে যাও।'

রদনিকা মাথা হেলিয়ে উত্তর দিল, 'যে আজ্ঞা।'

মৈত্রেয় বললে, 'রদনিকে, তুমি তাহলে এই বলি-দ্রব্য আর প্রদীপটা ধর। আমি গিয়ে খিড়কির দরজাটা খুলে দিচ্ছি।' বলে মৈত্রেয় এগিয়ে গিয়ে খিড়কির দরজাটা খুলে দিয়ে একপাশে সরে গিয়ে হাতের লাঠিটা আনতে ভেতর দিকে গেল। রদনিকা দরজার কাছে এগিয়ে গেল।

ওদিকে খিড়কির দরজায় হেলান দিয়ে বসন্তসেনা ভয়ে, আতঙ্কে শিউরে শিউরে উঠছিল। শয়তান শকার আবার এদিকেই আসছে যে। কি করবে, কোন দিকে পালাবে, পালাতে গিয়ে ফের শয়তানটার হাতেই পড়বে কিনা—ভাবতে ভাবতে দিশাহারা হয়ে পড়ছিল বসন্তসেনা। ঠিক সেই সময় ভেতর থেকে খিড়কির দরজাটা কেউ খুলে দিল। শরীরে যেন প্রাণ ফিরে এল তার! ঘুরে ভেতরে ঢুকতে যাবে, দেখে একজন মেয়ে, অনুমান করল যে কোনও দাসীই হবে, জ্বলন্ত প্রদীপ হাতে নিয়ে এগিয়ে আসছে। মনে মনে বলল বসন্তসেনা—যদি বা কেউ অনুগ্রহ করে দরজাটা খুলে দিলে, এখন এই আলোর মধ্যে কি করে দাঁড়াবে সে। চট্ করে মাথায় বুদ্ধি এল। রদনিকা যেই দরজাটা দিয়ে বেরুতে যাবে, অমনি আঁচলের বাতাস দিয়ে প্রদীপটা নিভিয়ে দিল।

হঠাৎ অন্ধকার হয়ে যেতে ভেতর থেকে মন্ত্রপাঠ থামিয়ে চারুদত্ত জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হল, মৈত্রেয়?'

মৈত্রেয় উত্তর দিল, 'সখা, খিড়কির দরজাটা খুলে যাওয়ায় একটা

দমকা হাওয়া এসে প্রদীপটা নিবে গেল।' তারপর মুখ ফিরিয়ে বলল, 'রদনিকে। তুমি খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাও। আমি ভেতর বাড়ী থেকে প্রদীপটা জ্বেলে নিয়ে আসছি।'

রদনিকা দরজা দিয়ে বেরিয়ে এগিয়ে গেল।

সেই সুযোগে বসন্তসেনাও বাড়ীর ভেতর ঢুকে গেল। ঢুকে গিয়ে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। এবার আর ভয় নেই। ভেতর থেকে জ্বলন্ত প্রদীপ হাতে মৈত্রেয়কে বেরিয়ে আসতে দেখে তাড়াতাড়ি বারান্দার একটা স্তম্ভের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল বসন্তসেনা। মৈত্রেয় চলে গেল।

রদনিকা তখন বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে। রাজপথের চৌমাথা তার অপরিচিত নয়। প্রায় রোজই সে আসে। অন্ধকারেও তাই এগিয়ে যেতে তার কোনও অসুবিধা হল না। কিছুদূর এগোতেই মানুষের গলার স্বর শুনতে পেল। তা রাজপথে এমন কিছুলোক থাকেই। সকলেই যে ক্ষতিকারক, তা নয়। রদনিকার এমনিতেও ভয়-ডর কম। তাছাড়া, মৈত্রেয় মহাশয় তো প্রদীপ নিয়ে আসছেনই। রদনিকা নির্ভয়ে এগিয়ে যেতে লাগল।

কিছু দূরে শকার তখন পণ্ডিতকে বলছে, 'পণ্ডিত! আমি আর একবার ভাল করে বসন্তসেনাকে খুঁজে দেখি। তুমিও দেখ।' বলে, অন্ধকারেই হাতড়ে হাতড়ে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'পণ্ডিত, ধরেছি, ধরেছি!'

'দূর মুর্খ! এত আমি!' পণ্ডিত ধমক দিয়ে উঠল।

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে শকার বলে উঠল, তুমি? 'তুমি এখানে কি করছ?'

'আমিও তো খুঁজছি!' পণ্ডিত হেসে উত্তর দিল।

'ওদিকে গিয়ে খোঁজো! যাও! বলে শকার আবার উল্টো দিকে এগুতে লাগল। তারপর ফের চেঁচিয়ে উঠল: ধরেছি, 'ধরেছি!'

'মশাই আমি যে আপনার দাস।' বেচারা দাস ভয়ে ভয়ে বলে উঠল।

'দাস! তুই বেটাচ্ছেলে এখানে কি করছিস রে? যা! সরে দাঁড়া এখান থেকে।' দাসকে খুঁজতে খুঁজতে রদনিকাকে পেয়ে গেলো। একেবারে রদনিকার খোঁপায় হাত পড়তেই আঁকড়ে ধরল শকার। আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল, 'এইবার! এইবার কোথায় যাবে, সখী! পণ্ডিত, পণ্ডিত। এইবার বসন্তসেনাকে ঠিক ধরছি। দেখবে এসো।'

ভয়ানক জোরে চুলে টান পড়তেই রদনিকা চীৎকার করে উঠল, 'মশাই, কারণ কি, কারণ কি! আমি বসন্তসেনা নই! ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন আমাকে।'

গলা শুনে পণ্ডিত দৌড়ে এল।—'ও শকার! এযে অন্যমেয়ের গলা মনে হচ্ছে।'

শকার হেসে বলল, 'আরে না' না। দই-সরের লোভে বেড়াল গলার স্বর বদলায়, এ বেটিও তেমনি গলার স্বর বদলেছে, বুঝতে পারছ না।'

'তাই নাকি? তা হতেও পারে।' পণ্ডিত খানিকটা সংশয়ের স্বরে বললে, 'বিচিত্র নয় কিছু! বসন্তসেনা তো নানাবিধ নাট্যকলা অভ্যেস করেছে। এখন সুযোগ বুঝে স্বরের নৈপুণ্য দেখাচ্ছে।'

ওদিকে মৈত্রেয় তখন প্রদীপ সামলাতে সামলাতে এগিয়ে আসছে, পাছে হাওয়ায় নিভে যায়! বিড়্বিড়্ করে নিজের মনেই বলছে, হাঁড়িকাঠ দেখে পাঁঠার প্রাণটা যেমন ধড়্ফড়্ করতে থাকে প্রদীপটাও সেইরকম বাতাসে ফর্ফর্ করছে। নিভে না গেলে বাঁচি। পথদীপিকাগুলোও কাঁপতে কাঁপতে জ্বলছে। হবেই। রাজার কর্মচারীগুলো সব চোর। তেল চুরি করলে আর আলো জ্বলবে কি করে। যেমন রাজা তেমন তাদের কর্মচারী! হায়! দেশের কি দুরাবস্থা। রাজপথে আলো নেই। ঠিক তখনই রদনিকার আর্তচিৎকার কানে গেল মৈত্রেয়র। শব্দ লক্ষ্য করে দৌড় দিল মৈত্রেয়।—'কি হয়েছে, কি হয়েছে, রদনিকা?'

মৈত্রেয়কে ছুটে আসতে দেখে পণ্ডিত তো ভয় পেয়ে গেল।

শকারও যেন একটু থতমত খেয়ে গেছে। তাহলে এই মেয়েটা সত্যিই বসন্তসেনা নয়। রদনিকার খোঁপা থেকে হাত সরিয়ে নিল সে।

মৈত্রেয় সামনে এসে প্রদীপের আলোয় রাজার শ্যালককে ভাল করে দেখেই বুঝল একটা গোলমাল হয়েছে। রদনিকার খোঁপা শকার ছেড়ে দিতে সে ছিটকে দূরে সরে গেছল। তার একহাতে তখনও নৈবেদ্যর থালা ধরা। এবার এগিয়ে বলল, 'মৈত্রেয় মশায়! দেখুন, এই লোকটা আমাকে কি অপমান করল। আমার কেশাকর্ষণ করেছে।'

মৈত্রেয় রাগে কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'না, না, এতো তোমার অপমান নয়, চারুদত্তের অপমান। চারুদত্ত আজ দরিদ্র হয়ে গেছে বলে কিছুলোক তো বেশ আনন্দে পেয়েছে। ওই হারামজাদা রাজার শালা সংস্থানক! দুর্জন! দুর্মনুষ্যটাও তাদের মধ্যে একজন। চারুদত্ত দরিদ্র হলেও তার গুনে সমস্ত উজ্জয়িনী কি এখনও অলঙ্কৃত নয়? তবে তুই, রাজার শ্যালা, সব জেনেও তাঁরই বাড়ীর মেয়ের গায়ে হাত দিতে সাহস করিস! এই বাঁশের লাঠি দিয়ে আজ তোর মাথাটা আমি ভেঙ্গে ফেলে দেব।'

বলেই হাতের লাঠিটা উচিয়ে তেড়ে গেল মৈত্রেয়।

তখনই পণ্ডিত একেবারে হাঁটু গেড়ে তার সামনে বসে পড়ে জোরহাত করে বলল, 'ওগো ব্রাহ্মণ, মেরো না, মেরো না! ক্ষমা করো! আর একজনকে মনে করে ভুল ক্রমে আমরা এই কাজটা করেছি।'

মৈত্রেয় চটে গিয়ে বললে, 'কাকে খুঁজছিলে, এই অন্ধকার রাত্রে? পণ্ডিত একটু ইতস্তত করে, কাব্যের ঢঙে বলল, 'সে কামাতুরা নারী (নারী) একজনা।'

মৈত্রেয় আরও রেগে গেল।—'কি, এই স্ত্রীলোককে-মানে আমাদের রদনিকাকে খুঁজছিলে।'

তেমনি কাব্যের ভঙ্গীতেই পণ্ডিত তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'না,

না, ছি, ছি, এরে না—সে কোন এক স্বাধীন যৌবনা, কোথায় যে পালালো সে—তারি ভ্রমে এই বিড়ম্বনা।—সে যা হোক। মৈত্রেয় মশায়! একটা প্রার্থনা করি! দয়া করে এই বৃত্তান্ত চারুদত্ত মহাশয়কে জানাবেন না।'

'সে না হয়, নাই বললাম।' মৈত্রেয় একটু শান্ত হয়ে বলল, 'তা তোমাকে তো ভাল লোক বলেই মনে হচ্ছে। তুমি এই সংস্থানকটার সঙ্গে আছ কেন? এই পাজী, হতভাগাটার সঙ্গত্যাগ কর। নইলে কোনদিন ভয়ানক বিপদে পড়বে।' এই কথা বলে মৈত্রেয় রদনিকার কাছে চলে গেল।

সুযোগ বুঝে শকার, যার আর একনাম সংস্থানক, এগিয়ে গেল পণ্ডিতের কাছে। রীতিমত বিদ্বেষ ভরা স্বরে বলল, 'কেন বল দিকি ওই ব্যাটা বিটলে বাউনটার পায়ে ধরে ক্ষমা চাইতে গেলে?'

'আমি বড় ভীত হয়ে পড়েছি।' পণ্ডিত উত্তরে বলল।

'কার কাছে ভীত?—'

'সেই মহাত্মা চারুদত্তের গুনের কাছে।'

'এহ্!' শকার মুখভেংচে বলে উঠল, 'মহাত্মা না কচু। যার ঘরে গিয়ে কেউ এক মুঠো অন্ন পায় না, তার আবার গুন কিসের?'

'না, না, ওকথা বলো না', পণ্ডিত প্রতিবাদের স্বরে বলল—'নিদাঘকালেতে ছিল পূর্ণ জলাশয়, লোকতৃষ্ণা নিবারিয়া এবে শুষ্ক প্রায়।'

'লোকতৃষ্ণা? সে ব্যাটাচ্ছেলে আবার কে হে, পণ্ডিত?'

পণ্ডিত প্রায় ধমকে উঠল, 'মুর্খ। আমি চারুদত্তের বদান্যতার কথা বলছি। তারপর মুর্খের সঙ্গে তর্ক করা বৃথা ভেবে বলল, 'যাকগে, এসো এখন, এখান থেকে যাওয়া যাক।'

'না, না, যেতে হয় তুমি যাও। আমি বসন্তসেনাকে না নিয়ে এখান থেকে নড়ছি না।'

'বসন্তসেনা তো পালিয়েছে।'

'পালিয়েছে? কি করে পালালো?'

'কি করে পালালো।' পণ্ডিত ভেংচে উঠল, 'তা আমি কি করে জানবো। এখন তুমি যাবে কি না এখান থেকে বলো?'

'উহুঁ'। বসন্তসেনাকে না নিয়ে আমি যাব না।' গোঁয়ারের মত শকার বলল।

পণ্ডিত এবার দৃঢ় স্বরে বলল, 'মুর্খ। একথা কি তুমি কখনও শোননি যে স্তম্ভে বাঁধা যায় হাতী, বল্গা-রজ্জু দিয়া হয় অশ্বের বন্ধন, আর হৃদে বাঁধা যায় নারী, তা যদি না পারো, তবে করহ গমন। বুঝেছো? এখন চলো। যাওয়া যাক।'

'যেতে হয় তুমিই যাও। আমি যাচ্ছি না।' শকার তেমনি একগুঁয়ে স্বরেই বলল।

এবার পণ্ডিত সত্যিই বিরক্ত হল। বলল, 'বেশ। আমি তবে চললাম।'

পণ্ডিত সত্যিই চলে গেল।

সেই সময় মৈত্রেয় মশাই রদনিকাকে নিয়ে পূজা দিয়ে ফিরলো। একেবারে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল শকারের সঙ্গে। রদনিকা পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গিয়ে একটু দূরে দাঁড়িয়ে পড়ল। দুর্জন শকারটা না আবার কোন ঝামেলা পাকায়।

মৈত্রেয়কে দেখেই শকার দাঁত বার করে যেন তেড়ে এল।—'এই, এই, টিকিওলা বিটলে বাউন। শোন্ এদিকে। বোস্, বোস্ এখানে।'

মৈত্রেয় একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, 'আমাদের তো বসিয়েই দিয়েছে। আর বসব কি।'

শকার ব্যঙ্গের স্বরে বলল, 'কে বসিয়ে দিলে?'

'দৈব, আবার কে।'

'তবে ওঠ্।' শকার হেসে বলল।

'উঠব এক সময়ে।' দৃঢ়স্বরে মৈত্রেয় বলল।

'তাই নাকি? তা কখন উঠবি?'

'যখন দৈব আবার অনুকূল হবে, তখন।'

'আহারে। কবে দৈব অনুকূল হবে তাই ভেবে এখন বসে বসে কাঁদ।'

'কাঁদিয়েই তো রেখেছে, আর কাঁদব কি।' স্তিমিত স্বরে মৈত্রেয় উত্তর দিল।

'আহা সারাদিনরাতই বুঝি কাঁদছিস? কাঁদাচ্ছে কে রে?'

'দারিদ্র—আবার কে?'

'তবে হাস্ না। খিল্‌খিল্ করে হাস্?'

এক সময়ে না একসময়ে তো হাসবই।

'ওহো হো।' শকার নাকি সুরে বিদ্রূপ করে বলল, 'সে কবে রে? কখন-কখন?'

'যখন আবার চারুদত্ত মশাইয়ের প্রচুর ধনঐশ্বর্য হবে।—যখন—'

'থাম্, থাম্। ব্যাটা বিটলে বটু।' শকার দাঁত কিড়্‌মিড়্ বলে উঠল, 'শোন। আমার নাম করে তোদের মহাত্মা না ফহাত্মা চারুদত্তকে গিয়ে বলবি যে বসন্তসেনা আমাকে ফাঁকি দিয়ে তার ঘরে গিয়ে লুকিয়েছে। আমি বসন্তসেনার প্রতি অনুরক্ত। তা, এখন যদি মানে মানে আমার হাতে বসন্তসেনাকে তুলে দেয়, বিচারালয়ে বিনা নালিশে, তাহলে চারুদত্তের সঙ্গে আমার প্রীতি সদ্ভাব থাককে। নচেৎ তার সঙ্গে আমার আমরণ শত্রুতা। —এই কথাগুলো তাকে তুই শীগগিরই গিয়ে জানিয়ে দে। আর যদি না বলিস্, তাহলে কপাটের তলে ভাঙ্গা কদ্‌বেলের মত মাথাটা তোর মড়্‌মড়্ করে ভাঙ্গব। বুঝেছিস্?'

মৈত্রেয় বুঝতে পারল যে এই জানোয়ারটা একটা কোন্দল বাধাবার জন্য তৈরি হচ্ছে। তাই বেশী না ঘাটিয়ে শুধু বলল,—'আচ্ছা তাই বলব।' বলে গৃহের দিকে চলে গেল।

মৈত্রেয় চলে যেতে আর অপেক্ষা করা বৃথা বুঝে শকার দাসকে ডাক দিল। 'বাছা দাস। পণ্ডিতটা বুঝি সত্যিই চলে গেল।

'হ্যাঁ, প্রভু।' দাস দূর থেকে উত্তর দিল।

'তবে চল! আমরাও যাই।' দাসকে নিয়ে শকার চলে গেল।



চারুদত্ত অঙ্গনের এক ধারে দাঁড়িয়ে বাস্তুদেবতার উদ্দেশ্যে মন্ত্রোচ্চারণ সমাপ্ত করার মুখে লক্ষ্য করলেন বারান্দার স্তম্ভের আড়ালে কেউ একজন এসে দাঁড়িয়েছে। তিনি ভাবলেন বুঝি রদনিকা ফিরে এসেছে। তবু নিশ্চিত হবার জন্য তিনি বললেন, 'কে ওখানে? রদনিকে? বাতাস বইছে। রোহসেন কোথায় গেল দেখ। ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে। ওকে ঘরে নিয়ে এস। আর হ্যাঁ, এই চাদরটা নাও। ওকে ঢেকে এনো।' এই বলে চাদরটা কাঁধ থেকে নিয়ে উনি ছুঁড়ে দিলেন রদনিকার দিকে।

বসন্তসেনাই তো আসলে স্তম্ভের আড়ালে লুকিয়েছিল। চারুদত্ত বুঝতে পারেন নি। বসন্তসেনা মনে মনে বলল—আমাকে উনি ওঁর দাসী বলে মনে করেছেন। তবু চাদরটা লুফে নিল সে। হাতে নিয়ে আঘ্রাণ করে সস্পৃহভাবে অস্ফুটে উচ্চারণ করল, 'ও মা! চাদরটাতে জাতী-ফুলের গন্ধ যে। তবে দেখছি, যৌবনের সুখে এখনও ওঁর ঔদাস্য হয় নি।'

ওদিকে চারুদত্ত আবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন রদনিকা তেমনি ভাবেই দাঁড়িয়ে আছে। তিনি বললেন, 'কি হল, রদনিকে। রোহসেনকে নিয়ে ভেতরে এসো।'

বসন্তসেনা নিজের মনেই বলল, উনি এখনও জানেন না যে এই হতভাগীনিই এখন ভেতরে এসে লুকিয়েছে।

'কি হল, রদনিকে? উত্তর নেই কেন?' চারুদত্ত আবার প্রশ্ন করলেন।

ঠিক সেই মুহূর্তে মৈত্রেয় প্রদীপ হাতে, পেছনে রদনিকাকে নিয়ে প্রবেশ করল। চারু দত্তের শেষ কথাটা মৈত্রেয়র কানে গিয়েছিল।

সে বলে উঠল, 'কাকে রদনিকা বলছ, সখা? এই তো সে আমার সঙ্গে ফিরছে?

চারুদত্ত-ও দেখলেন।—'তাই তো। তবে উনি কে? ওই আলো আঁধারিতে দাওয়ায় দাঁড়িয়ে আছেন। কাকে আমি দাসী বলে সম্বোধন করলাম। ছি। ছি।'

ততক্ষণে মৈত্রেয় প্রদীপ হাতে এগিয়ে গেছে। দেখেই চিনতে পারল সে। তাড়াতাড়ি নেমে চারুদত্তের কাছে গিয়ে বলল, 'সখা। এ যে স্বয়ং বসন্তসেনা।'

'তাই!' বলে চারুদত্ত দুপা এগিয়ে গিয়েও থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়লেন। নিজের মনেই বলে উঠলেন, 'শরতের মেঘে ঢাকা চাঁদের মত—কিন্তু না। পরস্ত্রী দর্শন করা উচিত নয়।'

'আরে কাকে তুমি পরস্ত্রী বলছ? ইনি তো বসন্তসেনা। সেই কামদেবের মন্দিরে তোমাকে দেখা অবধি ইনি তোমার প্রতি অনুরক্তা।' মৈত্রেয় উৎসাহ ভরেই বলল, কিন্তু গলার স্বর নামিয়ে।

চারুদত্ত এবারে আরও একটু এগিয়ে গেলেন। বসন্তসেনাও দুচোখ মেলে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল চারুদত্তের দিকে।

কয়েক মুহূর্ত উভয়েই উভয়ের দিকে মুগ্ধ আবেশে তাকিয়ে রইল। তারপর চারুদত্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কতকটা যেন আপন মনেই বলে উঠলেন—প্রচুর ঐশ্বর্য মোর যখন নিঃশেষ, তখনি উদয় হৃদে প্রেমের আবেশ।' তারপর আবার মুখ তুলে বসন্তসেনার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমি তোমাকে চিনতে না পেরে আমার দাসী ভেবে তোমার প্রতি যে আচরণ করেছি, সে জন্যে আমি অপরাধী, তুমি আমাকে মার্জনা কর।'

বসন্তসেনা তাড়াতাড়ি বলল, 'আমার মত অযোগ্য লোক যে আপনার গৃহে প্রবেশ করেছে, এতে আমিই অপরাধী। আমি নতশিরে প্রণাম করে আপনার ক্ষমা প্রার্থনা করি।' বলে দুহাত জড়ো করে নত হয়ে প্রণাম করল।

মৈত্রেয় আর থাকতে না পেরে বলে উঠল, 'ওগো, তোমরা

ছজনে ক্ষেতের ধানের মত পরস্পর মাথা নোয়ানুয়ি কর—আমিও উষ্ট্র-শিশুর জানুর মত নুয়ে, তোমাদের দুজনের কাছেই, ক্ষমা প্রার্থনা করছি।'

এ কথায় চারুদত্ত-বসন্তসেনা—দুজনেই হেসে ফেলল। চারুদত্ত বললেন, 'থাক সখা। তোমার আর অনুনয় বিনয়ে কাজ নেই।'

বসন্তসেনা মুগ্ধ হয়ে চারুদত্তকে দেখছিল, শুনছিল তাঁর কথা। মনে মনে বলল, এঁর বাক্যালাপ কি পরিপাটী ও মধুর।—কিন্তু আজ এখানে এভাবে এসে বেশীক্ষণ থাকা উচিত নয়। কিন্তু এই অলঙ্কারগুলি। আচ্ছা, এখানেই রেখে যাই না কেন? এইভেবেই বসন্তসেনা বলল, 'মহাশয়। যদি আমার প্রতি এত অনুগ্রহই হয়ে থাকে, তাহলে আমি এই অলঙ্কারগুলি আপনার গৃহে রেখে যেতে ইচ্ছা করি। এই অলঙ্কারগুলির জন্যই ঐ দুষ্ট লোকগুলো আমার পিছু নিয়েছে।'

'সে কি? কে? কারা?' চারুদত্ত অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন।

বসন্তসেনার হয়ে উত্তর দিল মৈত্রেয়।—'ওই বজ্জাত রাজার শ্যালক সংস্থানক। সে কি বলেছে জানো? বসন্তসেনা নাকি ওকে এড়াবার জন্যই তোমার গৃহে প্রবেশ করেছে। ও নাকি বসন্তসেনার প্রতি অনুরক্ত! তাই বসন্তসেনাকে ওর চাই। এখন তুমি যদি বিচারালয়ের বিনা নালিশে, আপনা হতেই ওর হাতে বসন্তসেনাকে সমর্পণ করো, তাহলে তোমার সঙ্গে ওর প্রীতি-সদ্ভাব থাকবে—নচেৎ আমরণ ওর সঙ্গে তোমার শত্রুতা হবে।'

চারুদত্ত হেসে বললেন, 'সে নিতান্তই মুর্খ।'

'হস্তিমুর্খ।' মৈত্রেয় যোগ করল।

চারুদত্ত বসন্তসেনার দিকে ফিরে বললেন, 'আমার এ গৃহ তো এখন অলঙ্কার রাখবার উপযুক্ত স্থান নয়, বসন্তসেনা।'

বসন্তসেনা সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে বলল, 'ওকথা বলবেন না। লোকে যে জিনিষ রাখে, সে মানুষের কাছেই রাখে—ঘরের কাছে নয়।'

চারুদত্ত মৃদু হাসলেন। তারপর মৈত্রেয়র দিকে ফিরে বললেন, 'সখা। বসন্তসেনার এই অলঙ্কারগুলি রেখে দাও।'

সাগ্রহে হাত বাড়িয়ে দিল মৈত্রেয়।

বসন্তসেনাও হেসে মৈত্রেয়র হাতে অলঙ্কারগুলি দিয়ে বলল, 'অনুগৃহীত হলাম।'

মৈত্রেয় বলল, 'তোমার কল্যাণ হোক, জয় হোক, দেবী।'

মৈত্রেয়র ভাবভঙ্গী দেখে কপটশাসনের স্বরে চারুদত্ত বললেন, 'আরে মুর্খ, এ দান নয়—গচ্ছিত বস্তু।'

মৈত্রেয় চাপাস্বরে বলল, 'তাহলে চোরে নিয়ে যাক না।'

চারুদত্ত বললেন, 'আবার ফিরিয়ে দিতে হবে যে।'

মৈত্রেয় বিরস বদনে বলল, 'তবেই তো মুশকিল হল। এখন এগুলি যে আমার রাতের নিদ্রা হরণ করবে।'

'তোমার নিদ্রা হরণ হয় হোক।' চারুদত্ত বললেন, 'কিন্তু দেখো। এগুলো যেন হরণ না হয়।'

বসন্তসেনা এবার চারুদত্তকে বলল, 'মহাশয়। আমার ইচ্ছা, ইনি আমার সঙ্গে গিয়ে আমার বাড়ী পর্য্যন্ত পৌছে দেন।'

'ঠিক কথা।' চারুদত্ত বুঝলেন। একাকী যাওয়া এখন আর নিরাপদ নয়। 'মৈত্রেয়। তুমি এই দেবীর সঙ্গে যাও।'

'আমাকে মার্জনা কর, সখা।' ভীষণভাবে মাথা নেড়ে মৈত্রেয় বলল, 'আমি গরীব ব্রাহ্মণ। এই নিশাকালে রাস্তার চৌমাথায় গেলে ওই লোকগুলো কুকুরের মত আমাকে খেতে আসবে। আমি তাহলে মারা যাব। তার চেয়ে সখা। তুমিই এই কল-হংস-গামিনীর সঙ্গে রাজহংসের মত যাও না কেন—এতো তোমাকেই শোভা পায়?'

মৈত্রেয়র কথার ঢঙে চারুদত্ত বসন্তসেনা-দুজনেই হেসে ফেলল। চারুদত্ত বললেন, 'বেশ। আমি যাচ্ছি। তুমি রাজপথে যাবার উপযুক্ত মশাল জ্বালিয়ে নিয়ে এসো দিকি।'

ঐখান থেকেই মৈত্রেয় হাঁক পাড়ল: 'বর্দ্ধমানক। ও বর্দ্ধমানক।

মশালটা জ্বালাও তো হে।'

বর্দ্ধমানক ভৃত্য। সে ভিতর থেকেই উত্তর দিল: 'আরে, বিনা তেলে কি মশাল জ্বালানো যায়।'

শোনা মাত্রই মৈত্রেয় ও চারুদত্ত অপ্রতিভ হয়ে চুপ করে গেল। এক মুহূর্তে যেন চারুদত্তের বর্তমান দরিদ্রাবস্থার চেহারাটা ফুটে উঠল। বসন্তসেনার বুকে বড় ব্যথা বাজল। রাজ্যের সেরা ধনী আজ কি দরিদ্রই না হয়ে পড়েছে। লজ্জা পেয়ে সে মাথা নীচু করে রইল। কোন কথা জোগাল না মুখে।

কিন্তু সামলে নিলেন চারুদত্ত। দিগন্তে তাকিয়ে দেখলেন নবমীর চাঁদ উঠছে। উৎফুল্ল স্বরে তিনি বলে উঠলেন, 'সখা। মশালে আর কাজ নেই। ওই দেখো। উদিছে শশাঙ্ক এবে রাজমার্গ-দীপ, সাথে লয়ে গ্রহগণ। এক্ষুণি জ্যোৎস্নায় চরাচর পূর্ণ হবে। এসো বসন্তসেনা।'

পথে যেতে যেতে দুজনের বুকেই কত কথা তোলপাড় করতে লাগল। কিন্তু মুখে কেউই কিছু বলল না। যেন এই না বলার মধ্য দিয়েই দুজনের মনের কথা দুজনের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল। চারুদত্ত ভাবলেন—বসন্তসেনা একান্তভাবে তারই। আর বসন্তসেনা ভাবল—চারুদত্তকে না পেলে তার জীবনটাই অপূর্ণ থেকে যাবে।

অবশেষে বসন্তসেনার গৃহ এসে গেলো। অনুরাগ সহকারে চারুদত্ত বললেন, 'বসন্তসেনা। যাও। তোমার গৃহে এসে পড়েছি।'

বসন্তসেনা দরজা দিয়ে ঢুকতে গিয়েও সানুরাগ দৃষ্টিতে চারুদত্তের দিকে কয়েক মুহূর্তে তাকিয়ে রইল। তারপর মৃদু মধুর হেসে গৃহাভ্যন্তরে চলে গেল।

চারুদত্ত মুহূর্তকাল দাঁড়িয়ে থেকে নিজ গৃহের দিকে রওনা হলেন।



উদ্যানে তন্ময় হয়ে বসন্তসেনা একটি চৌকো পটে ছবি আঁকছে। চার পাশে ছোট ছোট পাত্রে বিভিন্ন রঙ গোলা। তুলিকা ডুবিয়ে ডুবিয়ে পটের ওপর বুলিয়ে যাচ্ছে। শেষ হয়ে গেল ছবি। নির্নিমেষ দৃষ্টিতে পটের দিকে দেখতে লাগল। দেখতে দেখতে জগৎসংসার যেন লুপ্ত হয়ে তার চোখের সামনে থেকে। কেবল পটের ছবিটি যেন জীবন্ত হয়ে তার দিকে চেয়ে মধুর হাস্য করতে লাগল।

এই সময় দাসী মদনিকা এল। আবেশ মগ্না বসন্তসেনাকে দেখল। আড়াল পড়ে যাওয়ায় পটের ছবিটি দেখতে পেল না সে। সে আর একটু এগিয়ে এসে গলায় আওয়াজ করে বলল, 'ঠাকরুণ, মা আজ্ঞা করলেন—স্নান করে দেবতাদের পূজা যেন করা হয়।'

বসন্তসেনা পট থেকে চোখ না সরিয়েই বলল, 'ওলো! মাকে বল্, আজ আমার শরীরটা ভাল নেই। স্নান করব না। আর আমার হয়ে বামুনঠাকুরই যেন আজকের পুজোটা সেরে নেয়।'

মদনিকা আরও একটু এগিয়ে এসে বসন্তসেনার পেছন থেকে উঁকি দিয়ে পটের ছবিটা দেখল। বুঝতে পারল সব। মুচকি হেসে বলল, 'ঠাকরুনকে ভালবাসি বলেই একটা কথা জিজ্ঞেস করছি। তোমার আজ এই রকম ভাব কেন হলো, বল দিকি?'

বসন্তসেনা হেসে জিজ্ঞেস করল, 'মদনিকা! আমাকে তুই কিরকম দেখছিস!'

মদনিকাও রহস্য করে বলল, 'ঠাকরুনকে আজ খুব আনমনা দেখছি। যেন ঠাকরুনের প্রাণের ভিতর কেউ আছে—আর তাঁকেই পাবার জন্য প্রাণটা খুব অস্থির হয়েছে?'

'ওমা।' বসন্তসেনা অকৃত্রিম বিস্ময়ে বলে উঠল, 'তুই তো ঠিক বুঝেছিস্ মদনিকা! পরের হৃদয় তো তুই খুব বুঝতে পারিস্ দেখছি!

মদনিকা বসন্তসেনার যোগ্য সহচরী। সেও কম সুন্দরী নয়। আর প্রেম? হ্যাঁ, মদনিকার জীবনেও প্রেম এসেছে বই কি। তা, সে প্রসঙ্গ যথা সময়ে। বসন্তসেনার প্রশংসা গায়ে না মেখে মদনিকা বলল, 'এতো খুব সুখের কথা, ঠাকরুন। তা বল দিকি, কোন সেই পরম ভাগ্যবান যুবা পুরুষকে অনুগ্রহ করে তোমার যৌবন-উৎসবে নিমন্ত্রন করেছো? সে কি কোনও রাজা না রাজবল্লভ? কার সেবা করার জন্য এত বিভোর হয়ে পড়েছো?"

বসন্তসেনা হেসে, বুঝি বা একটু ধমকের স্বরে বলল, 'ওলো মদনিকে, আমি ভালবাসা চাই, ভালবাসতে চাই, কারো সেবা করতে চাই না, চাই না কারো মন জুগিয়ে চলতে। বুঝলি?'

'ও। তবে বুঝি কোনও বিত্তালঙ্কার ব্রাহ্মণ-যুবাকে তোমার মনে ধরেছে?' মদনিকা ভ্রূভঙ্গী করে জিজ্ঞেস করল।

'ব্রাহ্মণ আমার পূজনীয়।' বসন্তসেনা মাথা নেড়ে বলল।

মদনিকা তবু হাল ছাড়ল না। ভাবল, এইবার তার অনুমান যথার্থ হবে। বলল, 'অনেক দেশ-বিদেশ, নগরে নগরে বাণিজ্য করে যার ধন-ঐশ্বর্য হয়েছে প্রচুর, এমন কোন বণিক-যুবাকে কি তোমার মনে ধরেছে?'

বসন্তসেনা এবারও রহস্য করে বলল, 'ওলো মদনিকে! তুই কি জানিস্ না যে বণিক-যুবকদের দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়াতে হয়। তাই, খুব ভালবাসা হলেও তারা অনায়াসে প্রনয়িনীকে ত্যাগ চলে যায়, আর যেখানে যায় সেখানেই আবার আর কাউকে জুটিয়েও নেয়। আর সব ক্ষেত্রে তা যদি নাও হয়, সময়ে সময়ে ভয়ানক দীর্ঘ বিচ্ছেদ-কষ্টতো ভোগ করতেই হয়। তাই না?'

এবার হাল ছেড়ে দিল মদনিকা। বসন্তসেনার মনের পুরুষের কোন সূত্র সে ধরতে পারল না। খানিকটা হতাশ স্বরেই তাই বলে উঠল, 'ঠাকরুন! আমি তো খেই পাচ্ছিনা। রাজা নয়, রাজবল্লভ

নয়, ব্রাহ্মণ নয়-বণিকও নয়, তবে না জানি ঠাকরুনের কাকে মনে ধরেছে।'

বসন্তসেনা কপট ভ্রূবিলাস করে বলল, 'ওলো! তুই বুঝি স্মরতোৎসবে আমার সঙ্গে কামদেবের মন্দিরে যাস্‌নি?'

'ওমা! তা যাবনা কেন? অবশ্যই গিয়েছি।' মদানিকা বলল

'তবে?' বসন্তসেনা তেমনি কপট রাগের ছলেই বলল, 'যেন কিছুই জানিস্ না, বুঝিস্‌ওনি—এমন ভাবে জিজ্ঞেস করছিস্ কেন?'

এইবার মদনিকা ঠিক বুঝতে পারল। তবু একটু সংশয়ের স্বরে প্রশ্ন করল, 'ও বুঝেচি। ঠাকরুন যাঁর ঘরে আশ্রয় নিয়েছিলে, তিনি বুঝি?'

'বল্‌তো তাঁর নাম কি?' মদনিকার মুখে সেই মধুর নামটা শুনতে উদগ্রীব হল যেন বসন্তসেনা।

'সেই বণিক-পটিতে যাঁর বাস?' মদনিকা নামটা এড়িয়ে বলল।

বসন্তসেনা কিঞ্চিৎ অধীর স্বরে বলল, 'ওলো। আমি তাঁর নামটা জিজ্ঞেস করেচি তোর কাছে।'

মদনিকা এবার স্পষ্ট করে বলল, 'ঠাকরুন, তিনি তো চারুদত্ত মহাশয়?'

বসন্তসেনা সহর্ষে বলে উঠল, 'বাঃ। মদনিকা। তুই এবারে ঠিক বুঝেচিস্।'

মদনিকা একটু থিতিয়ে গেল। ঠাকরুনকে ঠিক যেন অন্তর থেকে সমর্থন জানাতে পারল না। এই সংশয় তার মুখ দিয়ে ব্যক্ত হল। 'কিন্তু ঠাকরুণ। ইদানীং তো তিনি খুবই দরিদ্র হয়ে পড়েছেন?'

'জানি।' বসন্তসেনা দৃঢ় প্রত্যয়ের স্বরে বলল, 'জানি। আর সেজন্যেই তো তাঁকে আমি এত করে চাই।'

'কিন্তু—' মদনিকা কি বলতে গেল।

বাধা দিয়ে বসন্তসেনা বলে উঠল, 'আমি বুঝেছি, তুই কি বলতে চাইছিস্। আমাদের শ্রেণীর মেয়েরা কোনো দরিদ্র পুরুষে আসক্ত হলে লোকে তাদের ভারি নিন্দা করে—এই কথাই তো তুই বলতে

চাইছিস, মদনিকে?—আমি জানি।'

মদনিকা খানিক নীরস স্বরে বলল, 'ঠাকরুন, সহকার বৃক্ষ পুষ্পহীন হলে ভ্রমর কি আর মধু আহরণ করতে আসে?'

'ওলো মদনিকে, এত বুঝিস্, আর এটুকু জানিস না যে এই কারণেই তো পুরুষদেরই ভ্রমর বলে।'

'তা বটে।' মদনিকা সহাস্যে মেনে নিল। 'তা ঠাকরুণ। তাঁকে যদি আপনার মনেই ধরেছে, তবে এমন উদাসীন হয়ে এই উদ্যানে বসে তাঁর প্রতিকৃতি না দেখে, এখনই স্বয়ং তাঁরই সঙ্গে কেন একবার সাক্ষাৎ করে আসুন না।'

বসন্তসেনা একটু বা স্তিমিত স্বরে বলল, 'না মদনিকে। সহসা দেখা করতে গেলে, তিনি বিচলিত বোধ করতে পারেন, হয়তো দেখাই দেবেন না। কারণ প্রত্যুপকার করার ক্ষমতা যে তাঁর নেই, এ তো তিনি জানেন। তাই আমি দেখা করি না। তবে দেখা করার একটা অজুহাত তো আমার আছেই।'

'বুঝেছি।' মদনিকা ঠোঁটের কোণে হেসে বলল।—'সে জন্যই আপনার অলঙ্কারগুলি তাঁর কাছে গচ্ছিত রেখে এসেছেন?'

'ঠিক তাই। তুই ঠিকই ধরেছিস্ মদনিকে।' বসন্তসেনা হেসে উঠে দাঁড়াল। মদনিকার গালে ঠোনা মেরে বলল, 'তুই ভারী চালাক। একদিন তোরও সব জারিজুরি ভেঙে যাবে। তখন দেখব, তুই নিজেকে কত সামলাতে পারিস্।' বলে হাসতে হাসতে মদনিকার গলা জড়িয়ে ধরল।



রাজপথ উন্মুক্ত। শূন্য মন্দির।

'পালাচ্ছে—পালাচ্ছে, ধর্-ধর্ বেটা-চ্ছেলেকে। পালিয়ে গেল রে, আমার দশ স্নুবর্ণ মুদ্রা নিয়ে পালিয়ে গেল। ধর্-ধর্, কোথায় পালাবি তুই। তোকে আমি ধরবই।'

রাজপথ দিয়ে যে যার নিজের কাজে কর্মে যারা যাচ্ছিল, তারা সব গোলমাল শুনে থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ে পেছন ফিরে দেখতে লাগল। সকলেরই প্রশ্ন—ব্যাপারটা কি? পথিকেরা কেউই কিছু বুঝতে পারছে না। তবে একদল লোক যে হৈ হৈ করতে করতে তেড়েফুড়ে এদিকেই আসছে, তা তারা বুঝতে পারল।

সেই সময় হাঁফাতে হাঁফাতে, যেন প্রাণের দায়ে দৌড়তে দৌড়তে এক যুবক এসে উপস্থিত হল।

তখন চারপাশ থেকে পথিক লোকজন এসে যুবককে ঘিরে ধরে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে লাগল, 'কি কি, হয়েছে, মশাই? এমন পড়ি মরি করে ছুটচেন কেন?'

যুবক বিশেষ কারো প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে দম নিতে নিতে, যেন কতকটা নিজেকেই তিরস্কার করে বলতে লাগল, 'ওহ। কি নরক যন্ত্রণা। জুয়ারীদের শেষে এই অবস্থাই ঘটে; দড়ি-ছেঁড়া গাধার মত আমাকে ধরে পিটুনি দিয়েছে। এবার ধরতে পারলে আমার আর রক্ষে নেই। জুয়ার আড্ডার অধ্যক্ষ আর তার স্যাঙাত্‌রা সব আমাকে তাড়া করেছে। কর্ণ যেরকম বল্লম দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ঘটোৎকচকে মেরেছিল, আমাকেও ধরতে পারলে তেমনি খুঁচিয়ে মারবে ওরা। হায়! হায়! আমি এখন কি করি! কোথায় পালাই।' বলে যুবক এদিক ওদিক তাকাতে লাগল।

পথিক লোকজন যারা ঘিরে ধরেছিল, তারা সব সরে গেল। কারণ, জুয়ার আড্ডার অধ্যক্ষ স্বয়ং যার পেছু নিয়েছে, তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করা বৃথা। কেননা, সকলেই জানে যে ওই অধ্যক্ষ লোকটা কোনরকম দুষ্কর্ম করতেই পেছপা হয় না। একেবারে রাজপুরুষদের সঙ্গে তার নিত্য ওঠা বসা। রাজার শ্যালক শকার তো তার প্রাণের বন্ধু। বরং দূরে দাঁড়িয়ে মজা দেখাই ভাল।

যুবকের হঠাৎ মনে পড়ল যে খানিক দূরে, রাজপথটা যেখানে বেঁকে গিয়ে নদীর দিকে চলে গেছে, তার বাঁদিকে একটা উপবনের মত জায়গা আছে। জায়গাটা অপেক্ষাকৃত নির্জন এবং পরিত্যক্ত। সেখানে একটা ভাঙা মন্দিরও আছে বটে। শূণ্য মন্দির। কোনও মূর্তিটুর্তি নেই। আপাততঃ সেই মন্দিরে ঢুকে দেবতা হয়ে ভাঙা বেদীর ওপর বসে থাকি। এছাড়া আর বাঁচার পথ নেই। যুবক মনে মনে কথাগুলো ভেবেই দৌড় দিল।

পরক্ষণেই হৈ হৈ করতে করতে আড্ডাধারী আর তার স্যাঙাতরা এসে হাজির হল। কয়েকজন অতিরিক্ত কৌতূহলী পথিক মজা দেখবার জন্য এদিক ওদিক দাঁড়িয়ে রয়েছে। আড্ডাধারী তাদের উদ্দেশ্যে বলল, 'হ্যাঁ মশাইরা। একজন যুবককে এই পথে যেতে দেখেছেন?'

একজন পথিক সাহস ভরে এগিয়ে এসে বলল, 'কই না তো। দেখিনি তো? কেন, কি করেছে সেই যুবক?'

'আরে মশাই, দশ সুবর্ণ হেরে গিয়ে সেই ছোকরা জুয়ারীটা পালিয়ে গেল। আপনারা ঠিক বলচেন? এ পথে যায় নি?'

তখন আড্ডাধারীর প্রধান স্যাঙাত বলে উঠল, 'পালাবি কোথায়? পাতালে যদি বা যাস্, ইন্দ্রের আশ্রয় যদি করিস্ গ্রহণ—এড়াইয়া আড্ডাধারী, রুদ্রও নারিবে তোরে করিতে রক্ষণ। এই দেখ, দেখ পায়ের চিহ্ন। নিশ্চয়ই এই পথ দিয়েই গেছে। লোকজনদের জিগ্‌গেস করার দরকার নেই।'

'তাইতো। ঠিকই তো বলেচিস্।' আড্ডাধারীও পায়ের চিহ্ন

দেখে বলে উঠল। তারপর মুখ তুলে তাকাল। পথিকেরা তখন যে যার মত সরে পড়েছে। আড্ডাধারী দুতিনজন স্যাঙাতকে বলল, 'এই। তোরা ডান দিক দিয়ে যা। আমরা দুজন বাঁ দিকটা দিয়ে যাচ্ছি।'

পদচিহ্ন ধরে ধরে দুজনে এগুতে লাগল। যদিও রাজপথে অনেক পদচিহ্নই আছে। তবু, একেবারে সদ্য সদ্য দৌড়নোর ছাপ চিনে নিতে ওদের কোন কষ্ট হলো না। সেই উপবনের বাঁকের মুখে এসে উল্টো পায়ের চিহ্ন দেখা গেল। প্রধান স্যাঙাত ঠিক অনুসরণ করে বনের ভেতর সেই শূন্য মন্দিরের কাছে এসে হঠাৎ মুখ তুলে বলল, 'যাঃ।'

'কি হল?' আড্ডাধারী প্রশ্ন করল।

'মন্দিরের চাতালের সামনে এসে পায়ের চিহ্ন মিলিয়ে গেল যে।' স্যাঙাত বলল।

'তাই তো বটে।' আড্ডাধারীও দেখল। 'আচ্ছা চল্।—মন্দিরের পেছন দিকটাও একবার দেখে আসি।'

পেছন দিকে পাক খেয়ে আবার সামনে চলে এল তারা। এদিক ওদিক দেখতে দেখতে আড্ডাধারী আপন মনেই কতকটা বলে উঠল, 'কোথায় পালালো বল্ দিকি। ফাঁকা মন্দিরে কেবল কাঠের দেবতা বসে আছে, পায়ের চিহ্নও মিলিয়ে গেছে।—'

'কি কি? কিসের দেবতা বললে?' স্যাঙাত জিজ্ঞেস করল।

চারপাশে তাকাতে তাকাতেই উত্তর দিল আড্ডাধারী, 'কাঠের, কাঠের।'

'দুর।' স্যাঙাত বলল, 'কাঠ নয়, পাথর, পাথরের দেবতা।'

'দুত্তোর। আমি বলছি কাঠের।'

'আমি বলছি পাথরের।'

এবার আড্ডাধারী ক্ষেপে গেল স্যাঙাতের ওপর। 'ঠিক আছে। তর্কে কিবা প্রয়োজন? ধর্ বাজী।'

'বাজী? আর যদি হেরে যাও?' স্যাঙাত ঠোঁট বাঁকিয়ে বলল।

'ওরে, মাথুর কখনও জুয়াতে হারে না।' আড্ডাধারী মাথুর গর্ব ভরে বুকে চাপড় কষিয়ে বলল।

'তবে হয়ে যাক, একহাত।' বলতে বলতে কোমরের গেঁজে থেকে ছক্কা কাটি তিনটে বার করতে করতে হেসে স্যাঙাত আবার বলল, 'এমন জনমানব শূন্য নির্জন জায়গা আর কোথায় পাওয়া যাবে, অ্যাঁ।' বলেই দুহাতে ছক্কা কাটিগুলো খর্‌খর্‌ করে নাড়িয়েই মাটিতে ফেলল।

'কত পড়েছে?' মাথুর সাগ্রহে ঝুঁকে পড়ে বলল।

'তিরি। হেরে গেছো।' স্যাঙাতটি চেঁচিয়ে উঠতেই অন্য একটা গলার স্বরও শোনা গেল, 'বেটা হেরেছে, ইস্‌।' স্যাঙাত জেতার আনন্দে তা শুনতে পেল না। কিন্তু মাথুর শুনতে পেয়ে চম্‌কে উঠে—চারপাশে তাকাল। কিছু দেখতে পেল না। তখন স্যাঙাতকে বলল, 'শুনলি? বোধ হয়, মন্দির প্রাঙ্গণে জুয়ো খেলছি বলে দেবতা অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন—'ইস্‌।'

স্যাঙাত তো হেসে উঠে ঠাট্টা করে বলল, 'আহা-হা, হেরে গিয়ে এখন দেবতা দেখাচ্ছ। ঐ তো দেবতা চুপচাপ বসে আছে, বাবা।'

'কি বললি? হেরে গিয়ে—ঠিক আছে। দে আমাকে গুটি। মাথুর ছক্কা কাটি তিনটে দুহাতে ঘষেই দান ফেলল।

ওদিকে সেই জুয়ারী যুবক—যে মন্দিরে দেবতা সেজে বসে আছে, একেবারে চোখের সামনেই জুয়ার দান পড়ছে দেখে উত্তেজনায় আর নিজেকে সামলাতে পারল না। দাঁড়িয়ে উঠে ঝুঁকে পড়ল। মুখ দিয়ে কথা বেরিয়ে পড়ল—'এবার আমার দান।'

এবার মাথুর আর তার স্যাঙাত দুজনেই শুনতে পেল। দারুণ ভয় পেয়ে দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরে 'ভ্‌ভ্‌ভু-উ-ত্‌।' বলে চেঁচিয়ে উঠল। তারপর এক মুহূর্ত। কিছুই ঘটছে না দেখে পেছন ফিরে তাকাল। তাকিয়েই মাথুর বলে উঠল, 'আরে আরে।' এ কি কাণ্ড। একটু আগেই দেখলাম দেবতা বসে আছে; আর এখন দণ্ডায়মান। সর্বনাশ। ওরে। এযে জাগ্রত দেবতা। আমরা

এবার মলুম রে।'

ওদিকে নিজের ভুল বুঝতে পেরে যুবক দাঁড়িয়ে পড়েছে। বসার কথা আর মনে নেই। মনে মনে সে নিজের গালেই চড় মারতে লাগল। নড়াচড়ারও উপায় নেই। ধরা পড়তেই হবে। কিন্তু পা দুটো একটু একটু কাঁপতেই লাগল। ধরা পড়লে কপালে এবার কি ছিদ্দত্ আছে—কে জানে।

ওদিকে মাথুরের স্যাঙাতের মনে একটু একটু সন্দেহ হ'ল। মন্দিরের ভেতরটা যদিও অন্ধকার-অন্ধকার। কিন্তু বসা দেবতা দাঁড়িয়ে পড়ল কি করে। কাঠই হোক আর পাথরই হোক। এটা কি করে সম্ভব? সে ফিস্‌ফিস্ করে মাথুরকে বলল, 'দাঁড়াও। আমি একটু কাছ থেকে দেখে আসি।' বলে মাথুরকে ছেড়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে দেবতার দুহাতের মধ্যে গিয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, 'কে? কে তুমি? দেবতা! না মানুষ! সত্যি করে বল।'

কোন উত্তর এল না।

স্যাঙাত তখন মুখ ঘুরিয়ে মাথুরকে ডাকল,—'এই। কাছে এস।'

মাথুর বরং দুপা আরও পিছিয়ে দাঁড়াল।

স্যাঙাত এবার মরিয়া হয়ে দেবতার গায়ে আঙ্গুল দিয়ে খোঁচা মেরে উঠল, 'সত্য বল। কে তুমি?' বলেই দুপা পিছিয়ে এল।

সেই মুহূর্তে দেবতারূপী যুবক লাফ দিয়ে সিঁড়ি ভেঙ্গে দৌড় দিল।

মাথুর তক্ষুনি তাকে চিনতে পেরেই হেঁকে উঠল, 'ওরে সেই লোকটাকে ধর, ধর, পালাল।'

এবার মাথুর আর স্যাঙাত সহজেই যুবককে ধরে ফেলে কিল্ চড়, মুষ্টি, লাথি চালাতে লাগল। 'ব্যাটা শয়তান! মানুষের দশ সুবর্ণ মেরে দিয়ে পালাবি। পালা দেখি এবার।' বলে উত্তম মধ্যম প্রহার করতে লাগল।

যুবক মার খেতে খেতেই ভাবতে লাগল কি করে এদের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। ভেবে কোন কূল কিনারা পেল না।

তবু এত মার তো আর সহ্য করা যায় না। সে চেঁচাতে লাগল। বলতে লাগল, 'আমাকে দয়া করে ছেড়ে দিন। আমি প্রতিজ্ঞা করচি, আপনাদের স্বুবর্ণ আমি দিয়ে দেব।'

ওসব দেবো টেবো না মাথুর গর্‌গর্‌ করতে করতে বলল, 'এক্ষুনি দিতে হবে। দে।'

'এক্ষুনি দিতে হবে? 'যুবক মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। মাগো। আমার মাথা ঘুরচে।'

'কত কিছু হবে এখন তোমার।' জিভ ভেংচে মাথুর বলে উঠল 'মাথা ঘুরবে, পা টলবে। কিন্তু স্বুবর্ণ না দিলে তোমাকে ছাড়ছি না, চাঁদ। শীগগির বন্দোবস্ত কর্‌।'

'বন্দোবস্ত? যুবক মনে মনে একটা মতলব ভাঁজল, 'আচ্ছা, বন্দোবস্ত করছি।' বলে যুবক মাথুর স্যাঙাতের কাছে গিয়ে বলল, 'মহাশয়। আমি গরীব মানুষ। এই নাক-কান মলছি ট্যাঁকে অর্থ না নিয়ে আর জুয়া খেলব না। এ যাত্রা আপনি আমার কাছে যা পান, তার অর্ধেক নিয়ে আমাকে দয়া করে ছেড়ে দিন।'

স্যাঙাত ভাবল কিছুই না পাওয়ার চেয়ে অর্ধেক পাওয়াই ভাল। তাই বলল, 'আচ্ছা, তাই হোক।'

তখন যুবক মাথুরের কাছে গিয়ে তার পা টিপে দিতে দিতে বলল, 'মহাশয়। আপনাকে অর্ধেক দিচ্ছি। বাকী অর্ধেক আমাকে ছেড়ে দেওয়া হোক।'

মাথুরও ভাবল, নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল। বলল, 'ঠিক আছে। আপত্তি নেই। ছেড়ে দিলাম অর্ধেক।

যুবকের মুখে তখন হাসি ফুটল। 'যাক। ইনি অর্ধেক ছাড়লেন, উনিও অর্ধেক ছেড়ে দিলেন। তার মানে, পুরোটাই ছাড় হয়ে গেল। এইবার তবে আমি চলে যাই।' বলেই সটান হাঁটা দিল।

'এই-এই-এই।' স্যাঙাত আর মাথুর দুজনেই চেঁচিয়ে উঠল: 'পালাচ্ছিস যে বড়? অর্ধেক স্বুবর্ণ কই?'

যুবক যেন খুব অবাক হয়েছে এমনভাবে ফিরে বলল, 'সে কি মশাই? এই তো আপনি অর্ধেক ছাড়লেন, আর উনিও অর্ধেক ছেড়েদিলেন। পুরোটাই তো তাহলে ছাড় হয়ে গেলো! আবার ধাওয়া কচ্ছেন কেন?

'ওরে ব্যাটা ধূর্ত্ত। চালকি হচ্ছে আমাদের সঙ্গে? দাঁড়া তবে' বলেই যুবকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল দুজন। আমার নাম মাথুর। আর আমাকেই কিনা কলা দেখানো? জুয়াচোর কোথাকার। বলেই ঠাঁই ঠাঁই করে যুবককে মারতে মারতে বলল 'এক্ষনি দে স্বুবর্ণপুলী?

যুবক হতাশ হয়ে বলল, 'কোথথেকে দেব?'

মাথুর বলল, 'তোরা বাপকে বিক্রী করে দিবি।'

'বাপ নেই আমার।—'

'তবে মা-কে বিক্রি কর।—'

'মা-ও নেই আমার।' যুবক কেঁদে ফেলল।

'তবে নিজেকেই বিক্রি করে দে।'—মাথুরও ছাড়বার পাত্র নয়।

'ঠিক আছে, তাই দেব। নিজেকেই বিক্রি করে দেব।' যুবক আর মার খেতে রাজী নয়। বলল, 'আমকে অনুগ্রহ করে রাজমার্গে নিয়ে চলুন।'

'তবে তাই চল।' বলে মাথুর আর তার স্যাঙাত, যুবককে ধরে নিয়ে রাজমার্গের চৌমাথায় এসে দাঁড়াল। লোকজন বেশ চলাচল করছে। কেউ কেউ মানুষকে দেখেই তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছে। সবাই জানে মাথুর লোকটা ভালো মোটেও নয় যা হোক।

যুবক গলা ছেড়ে, পথিক লোকজনদের উদ্দেশ্য করে বলল, 'মশাইরা! আপনাদের মধ্যে যদি কেউ দয়াবান থাকেন, তাহলে মাত্র দশ স্বুবর্ণ দিয়ে এই আড্ডাধারীর কাছ থেকে আমাকে কিনে নিন না। আনি আপনার ঘরে ভৃত্য হয়ে কাজ করব।'

যুবকের কথা কেউ কেউ শুনলই না। যারা শুনল, তারাও

এগিয়ে এল না।

মাথুর ক্রমশঃ অধৈর্য হয়ে পড়ছে। কেউ যুবককে কিনতে আসচে না দেখে এগিয়ে গিয়ে যুবককে টেনে নিয়ে ফের পেটাতে শুরু করল। 'বার কর সুবর্ণ! বার কর!'

'কোথথেকে বার করব?' বলে যুবক পথেই বসে পড়ল। আর মাথুর তার স্যাঙাত, মনের সুখে যুবককে পেটাতে লাগল। মারামারি দেখে লোকজন সভয়ে দূরে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল।

তখন দর্দুরক নামে এক যুবক, সেও একসময় পাকা জুয়ারী ছিল, কিন্তু যেমন হয়, জুয়া খেলে খেলে একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেছে বোধ হয় কোন একটা কাছে এই দিক দিয়ে যাচ্ছিল। ভীড় দেখে সে উকি মারল। দেখল, একটা যুবককে মাথুর আর তার স্যাঙাতটা নিয়ে খুব পেটাচ্ছে। ভাল করে দেখেই আহা-হা করে উঠল সে। সংবাহক ছেলেটাকে মারছে যে! ছেলেটার সঙ্গে তার একদিন আলাপও হয়েছিল। ভালই লেগেছিল। আর লোকগুলোর কাণ্ড দেখো! আড্ডাধায়ী জুয়ারীর প্রতি অত্যাচার করছে—অথচ কেউ ছাড়িয়েও দিচ্ছে না। ঠিক আছে। আমি দর্দুরক। দেখি, ব্যাটা মাথুরের কত তেজ।

মনে মনে কথাগুলো বলেই দর্দুরক ভীড় ঠেলে এগিয়ে গেল। 'এই! সব সরে যাও, সরে যাও, বাবার পথ দাও।' বলতে বলতে একেবারে মাথুরের সামনে গিয়ে বলল, 'এই যে মাথুর! নমস্কার!'

মাথুর না তাকিয়েই বলল, 'নমস্কার!'

দর্দুরক বললে, 'ব্যাপারটা কি বলতো, মাথুর? এই ছেলেটাকে এমন নির্দয় ভাবে মারছ কেন?'

মাথুর ভুরু কুঁচকে দর্দুরকের দিকে চেয়ে তাচ্ছিল্যের স্বরে বলল, 'মারছি, কারণ, এই ছেলেটা আমার কাছে দশ সুবর্ণ ধারে।'

দর্দুরক হেসেই উড়িয়ে দিল কথাটা, 'মাত্র দশ সুবর্ণ! দুর! এতো সামান্য কথা!'

মাথুর এবার ঠোঁটের কোনে হেসে দর্দুরকের আপাদমস্তক দেখে

নিল। দর্দুরকের পরনে ছেঁড়া কাপড়, ময়লা ফতুয়া আর কাঁধে একটা ছেঁড়া চাদর। মাথুর এগিয়ে এসে তার কাঁধ থেকে ছেঁড়া চাদরটা একটানে তুলে নিয়ে জমায়েত লোকজনদের দিকে তুলে ধরে বলল, 'দেখুন, মশায়রা। ছেঁড়া, ময়লা পোষাক, আর এই ছেঁড়া কুটিকুটি চাদর পরে এই লোকটা বলে কিনা, দশ স্বুবর্ণ সামান্য কথা।'

জমায়েত লোকেরা হা-হা করে হেসে উঠল। তারা মজার গন্ধ পেয়েছে।

দর্দুরক কিন্তু মোটেও দমল না। সে ভেংচি কেটে বলল,—'ওরে মুর্খ! দশ স্বুবর্ণ আমি এক্ষুনি "কট" খেলে তোকে দিয়ে দিতে পারি। বুঝলি! যার ধন আছে সে ধন কোলে করে নিয়ে দশ-জনকে দেখায় না।'

মাথুরও ভেংচি কেটে বলল, 'থাক! অনেক বলেচেন, মহাশয়! দশ স্বুবর্ণ আপনার কাছে সামান্য হতে পারে, কিন্তু ঐ আমার ঐশ্বর্য।'

দর্দুরক চেঁচিয়ে কিছু হবে না বুঝে আপোষের স্বরে বলল, 'মাথুর শোন, একটা কথা বলি। আরও দশ স্বুবর্ণ ওকে ধার দাও। তাই নিয়ে ও আরেকবার খেলুক।'

মাথুর ঘাড় বেঁকিয়ে বলল, 'তাতে কি হবে?'

দর্দুরক হেসে বলল, 'যদি জেতে তো দিয়ে দেবে।'

'আহা-হা-হা!' মাথুর আবার ভেংচে বলে উঠল, 'আর যদি না যেতে?'

দর্দুরক একটু থতমত খেয়ে বলে উঠল,—'তা-তাহলে দেবে না।'

মাথুর এবার হাঁ-হাঁ করে তেড়ে এল দর্দুরকের দিকে। 'রেখে দে ওসব বাজে কথা। ধূর্ত কোথাকার। অত যদি দয়া তো তুই ওকে ধার দেনা!—আমি ধূর্ত মাথুর—জুয়ো খেলায় অন্যকে ঠকিয়ে বেড়াই—কোন ব্যাটাকে ভয় করি না। আর আমার সঙ্গেই চালাকি! ব্যাটা ধূর্ত পাজি কোথাকার!'

'কি হল ?' দর্দ্দুরক যেন ক্ষেপে গেল।—তুই পাজি কাকে বললি ?'

'তোকে—তোকে! তোকে বললাম পাজি।' মাথুর বলল।

'তোর বাপ পাজি।' দর্দ্দুরকও সপাটে উত্তর দিল।

'এই এই! বেশ্যাপুত্র কোথাকার! 'তুই জুয়া খেলিস না ?' মাথুর বিশ্রী মুখ ভঙ্গী করে দর্দ্দুরককে গাল পাড়ল।

দর্দ্দুরক গায়ে না মেখে বলে উঠল, 'হ্যাঁ, আমিও খেলতাম এক-সময়। এখন আর খেলি না!'

'আহা! সাধুপুরুষ!' মাথুর তেমনি হুমকি দেওয়া স্বরেই বলে উঠল, 'যা-যা! অনেক সাধুতা দেখিয়েছিস্! এবার সরে পড় এখান থেকে। নাহলে তোকেও ধরে পেটাবো।' এই কথা বলেই ফের সংবাহক যুবককে পেটাতে আরম্ভ করল।

আর তাই দেখে দর্দ্দুরকও ঝাঁপিয়ে পড়ে সংবাহক যুবককে ছাড়িয়ে নিয়ে এল। গর্জন করে মাথুরকে শাসালো, 'আমার অসাক্ষাতে যা পারিস্ করবি। কিন্তু আমার চোখের সামনে বেচারাকে এরকম কষ্ট দিতে পারবি না।'

'তবে রে—!' বলেই মাথুর দর্দ্দুরকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কিল, চড়, মুষ্টি চালাতে লাগল। মারামারিতে দর্দ্দুরক তত পটু না, বোঝা গেল। মাথুরের এক মুষ্টাঘাতে ছিটকে গিয়ে বসে পড়ল মাটিতে। মাথুরও ফের তেড়ে গেল। তাই দেখে দর্দ্দুরক বসে বসেই চেঁচিয়ে বলতে লাগল, 'ওরে বন্য-বরাহ! তুই আমাকে আজ রাজপথে মারলি, না! কাল তুই আমাকে রাজবাড়ীতে গিয়ে মারিস্ তো, তখন মজাটা দেখতে পাবি।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, দেখব যা!' মাথুর দাঁত বার করে ভেংচি কাটল।

'তাই নাকি ? দেখবি ? তা কি রকম করে দেখবি ?' দর্দ্দুরক বাঁ হাতের মুঠিতে ধুলো নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

তার কথা শুনে মাথুর সদর্পে এগিয়ে এসে চোখ দুটো বড় বড় করে বলল, 'এইরকম করে দেখব বুঝলি ?'

আর যেই না বলা, অমনি দর্দ্দুরক মুঠিতে ভরা হাতের ধুলো

ছুঁড়ে মারল মাথুরের দুই চোখে। তারপর সংবাহক যুবককে ইশারা করে বলল পালিয়ে যেতে। নিজেও একদিকে সরে পড়ল। জমায়েত লোকজন প্রায় সকলেই তো মারামারি দেখে আগেই পালিয়ে ছিল। বাকী কজনও এবার পালাল।

'উরে বাবারে! মেরে ফেললে রে! চোখ অন্ধকার করে দিলেরে!' মাথুর ছটফট করতে করতে চেঁচাতে লাগল চোখের যন্ত্রনায়! তার স্যাঙাত তাড়াতাড়ি তাকে ধরে নিয়ে বললে, 'চল চল! পুষ্করিনীর দিকে চল! চোখে জল দিলেই ঠিক হয়ে যাবে?'

ওদিকে দর্দুরক পালিয়ে যেতে যেতেই মনে মনে অনেক কথা ভাবছিল। ব্যাপারটা ভাল হল না। প্রধান আড্ডাধারী মানুষের সঙ্গেই বিরোধ হল। এখানে থাকা আর উচিত নয়। এই সমস্ত লোক সমাজের দুষ্টগ্রহ। দেশের অসৎ শাসকের সাহায্যপুষ্ট। এরা পারে না হেন নিকৃষ্ট কাজ নেই। প্রকাশ্য দিবালোকে তাকে হত্যা করলেও বিচারালয়ের সাধ্য নেই এসব লোককে শাস্তি দেয়। ওই পাজি রাজার শ্যালকের খাস অনুচর মাথুর। যেমন হয় আর কি। সমাজে তো এইসব লোকেরই দাপট বেশী। তবে রাজা পালকের আসনও এবার টলবে। বন্ধু শার্বলক তো বলল সেদিন, যে একজন সিদ্ধ পুরুষের নাকি আদেশ হয়েছে—আর্যক নামে কোনও এক গোয়ালার ছেলে রাজা হবে। গুপ্ত সমিতি গড়ে তিনি কাজও নাকি আরম্ভ করেছেন। প্রকাশ্যে বা গোপনে দেশের অনেক লোকই এখন তাঁর পেছনে। তাহলে, আমিও কেন তাঁর কাছেই যাই না! সেই ভাল।—

জুয়ারী যুবক সংবাহক ততক্ষণে ছাড়া পেয়ে প্রাণপণে দৌড় দিয়েছে। দর্দুরক আর মাথুরের মধ্যে বেশ ভালরকম গণ্ডগোলই পাকিয়েছে। ব্যাপারটা অনেকদূর গড়াবে শেষ পর্য্যন্ত সন্দেহ নেই। তা হোক। দর্দুরকের জন্যই আজ সে ছাড়া পেয়েছে, সে জন্য দর্দুরকের প্রতি কৃতজ্ঞতাই বোধ করল সে। মাথুর অবশ্য সহজে ছেড়ে দেবে না দর্দুরককে। তার মত ক্ষমতাবান লোকের চোখে

খুলো দিয়ে একদিন পালানো সম্ভব হলেও শেষ পর্যন্ত কি দর্দ্দুরক রেহাই পাবে! অবশ্য দর্দ্দুরকও কম ধুরন্ধর নয়। কলা কৌশলে সেও পারঙ্গম। তা থাকগে। এখন নিজেকে বাঁচানোই দায়। কোথায় যাবে সে এখন? কোথায় পালাবে? এইসব সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতেই সে দৌড়চ্ছিল। অনেকক্ষণ পেটে কিছু পড়ে নি। আর দৌড়ানো যাচ্ছে না। ধীরে ধীরে তার গতি শ্লথ হয়ে এল। সামনেই এক বিশাল অট্টালিকা। সে ঘুরে পেছন দিকে চলে গেল। এদিকটা নির্জন। ঠিক পথ নয় বলেই লোকজন নেই মনে মনে সে বলল, না জান এ কার গৃহ। আরে খিড়কির দ্বার খোলা দেখছি। একটু ইতস্ততঃ করে সে ঢুকেই পড়ল ভেতরে। কখন যে মাধুররা এখানে এসে পড়ে! আপাততঃ এখানেই লুকিয়ে থাকা যায় কি না চেষ্টা করে দেখা যাক।

ঢুকেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। তিলোত্তমার মত সুন্দরী এক নারী উদ্যান-মধ্যে, এক পাষাণবেদিকায় বসে মালা গাঁথছেন। এবং আর এক অনিন্দ্য-সুন্দরী যুবতী পশ্চাদদিকে দাঁড়িয়ে তাঁর কেশ পরিচর্যায় রত। দ্বিতীয় নারীটি যে সহচরী দাসী তা সংবাহক সহজেই বুঝতে পারল। সে সোজা গিয়ে উপবেশন রতা নারীর পায়ের কাছে আভূমি নত হয়ে প্রনাম করে বলল: 'ঠাকরুণ! আমি আপনার শরণাগত হলাম।'

'শরণাগতকে অভয় দিলাম!' বলেই উপবিষ্ট নারী মুখ তুলে দেখল আগন্তুকের দিকে। তখনই চোখ পড়ল খিড়কির দিকে। মুখ ফিরিয়ে সহচরীকে বললো, 'ওলো, খিড়কির দরজাটা বন্ধ করে দে!'

সহচরী তাড়াতাড়ি গিয়ে খিড়কি-দরজা বন্ধ করে ফিরে এল।

পাষাণ বেদিকায় উপবিষ্ট তিলোত্তমার মত সুন্দরী নারীই যে স্বয়ং বসন্তসেনা, তা অবশ্য সংবাহকের মত দরিদ্রজনের জানার কথা নয়। সে মুগ্ধ দৃষ্টিতে সেই অপার সৌন্দর্যের দিকেই তাকিয়েছিল। বুকের মধ্যে তার এমন এক সম্ভ্রম জাগল যা পূর্বে কখনও সে অনুভব করে নি।

বসন্তসেনা কথা বললো যেন সঙ্গীতের নিস্বন তার কানে মধুবর্ষণ করল। বসন্তসেনা জিজ্ঞেস করলো, 'কার ভয়ে পালিয়ে এসেছো?'

'ঠাকরুণ! পাওনাদারদের ভয়ে।' সংবাহক উত্তর দিল।

তখনই সহচরী মদনিকা এগিয়ে এসে একসঙ্গেই একগাদা প্রশ্নবান সংবাহকের দিকে ছুঁড়ে দিল, 'কোথ্‌থেকে আসচেন, মশায়? কি কাজ করেন মশায়? কার ভয়ে পালিয়ে এসেছেন মশায়?'

সহচরী মদনিকার প্রশ্ন করা শুনে বসন্তসেনা মুচকি হেসে মুখ ফিরিয়ে নিল। সংবাহকও প্রথমটা থতমত খেয়ে গেল।

তারপরই অবশ্য যথাসম্ভব করুণ স্বরে নিজের কথা বলে গেল। বলল, 'ঠাকরুণ, বলি শোন! পাটলিপুত্র আমার জন্মভূমি। আমি গৃহস্থ-সন্তান, গা টিপে দেওয়া আমার ব্যবসা!'

বসন্তসেনা চমৎকৃত প্রশংসার স্বরে বললো, 'বাঃ! আপনি তো বেশ একটি সুকুমার কলা শিক্ষা করেছেন দেখছি।'

সংবাহক তেমনি করুণ হেসেই বলল, 'হ্যাঁ ঠাকরুণ! প্রথমে শখ্‌ করেই বিদ্যাটি আয়ত্ত করেছিলাম। পরে এটিই আমার উপজীবিকা হয়ে দাঁড়ায়।

'তারপর কি হলো?' দাসী মদনিকা প্রশ্ন করল।

'তারপর ঠাকরুণ! জীবিকারই তাড়নায় এই উজ্জয়িনীতে এসে পড়ি। এবং একটি উত্তম কাজও জুটে যায়। এক মহৎ ধনী ব্যক্তির সেবা-শুশ্রূষায় নিযুক্ত হলাম। তিনি এমন প্রিয়দর্শন ও প্রিয়বাদী যে—কি বলব, তিনি দান করেও তা প্রকাশ করেন না। কেউ অপকার করলে সে কথা ভুলে যান। তাঁর দয়া-দাক্ষিণ্য এমনই যে পরকে তিনি নিজের মত দেখেন। তাঁর মত শরণাগত বৎসল আমি দুটি দেখি নি।'

মদনিকা আবার আগ্রহে জানতে চাইল, 'তারপর? তাঁর কাজ আপনিই ছেড়ে দিলেন না তিনিই আপনাকে ছাড়িয়ে দিলেন?'

'ঠাকরুণ, দুঃখের কথা আর কি বলব,' সংবাহক দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'তিনি করুণার বশবর্তী হয়ে দান করে করে…'

বসন্তসেনার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, '…তাঁর ধন নিঃশেষ হয়ে গেল, তাই না ?'

সংবাহক অবাক চোখে বসন্তসেনার দিকে চেয়ে বলল,—'না বলতেই আপনি কি করে জানতে পারলেন ?'

বসন্তসেনা উদ্‌গত দীর্ঘশ্বাস চেপে চাপা বেদনার স্বরে বললো, 'এ আর জানতে কি। ঋণ-ঐশ্বর্য দুর্লভ বস্তু। যে পুষ্করিনীর জল কেউ পান করে না, তাতেই অনেক জল থাকে।'

দাসী মদনিকা কথা ঘুরিয়ে তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করল, 'মশায়! তাঁর নামটি কি, তাতো বললেন না ?'

সংবাহক উৎসাহ পেয়ে বলল,' ঠাকরুণ! সেই ধরণীচন্দ্রের নাম কে না জানে ? বণিকপটিতে তাঁর বাস। তাঁর লোকপূজ্য নাম শ্রীযুক্ত চারুদত্ত!'

শোনামাত্রই আসন ছেড়ে উঠে পড়লো বসন্তসেনা। চারুদত্ত নামটি শোনা মাত্রই তাঁর সর্বাঙ্গে পুলক জাগল! উৎসাহ, আবেগে অধীর হয়ে সংবাহককে সাদরে আহ্বান জানালো, 'মহাশয়! তাঁরই কোন আত্মীয়ের এই গৃহ জানবেন!' মদনিকার দিকে ফিরে বললো, 'ওলো, একে বসতে দে। পাখা নিয়ে আয়। এর অত্যন্ত পরিশ্রম হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।'

সংবাহক তো এত আদর অভ্যর্থনা কল্পনাও করে নি। সে অবাক হয়ে ভাবল—কি আশ্চর্য্য! চারুদত্তের নাম কীর্ত্তনেই আমার এত আদর।—সাধু, আর্য্য চারুদত্ত, সাধু! পৃথিবীতে তুমিই জীবিত—আর সকলে শ্বাস-প্রশ্বাস ত্যাগ করে মাত্র। পরক্ষণেই সে বসন্তসেনার পদতলে বসে বলল, 'ঠাকরুণ। এই অভাগার জন্য অত উতলা হবেন না আপনি বসুন।'

বসন্তসেনা বললেন, 'আপনিও বলুন, কি হল ?'

'তারপর ঠাকরুণ, তিনি আমাকে তাঁর বেতনভুক পরিচারক করলেন। সুখেই ছিলাম। তারপর তাঁর সমস্ত ধন নিঃশেষ হয়ে গেল। শুধু চারিত্র্য মাত্র অবশিষ্ট রইল। সেই সময়, আমারও

মাথায় ভূত চাপল। আমি জুয়া খেলার ব্যবসায় ধরলাম।' বলতে বলতে সংবাহক মাথা নীচু করে ফেলল। শেষে স্তিমিত স্বরে বলল, 'সেই থেকে দুর্ভাগ্য আমাকে পাকে পাকে জড়াতে লাগল। সেই জুয়া খেলতে গিয়ে আজও আমি দশ সুবর্ণ হেরেছি।'

তার কথা শেষ হওয়া মাত্রই বাড়ীর সদরে একটা গোলমাল শোনা গেল।—'আমাকে উচ্ছন্নে দিলে রে—আমার সব অর্থ ঠকিয়ে নিলে রে।'

গলা শুনেই সংবাহক চমকে উঠল! মাথুরের গলা! ঠিক সন্ধান পেয়ে গেছে। হায়, হায়! আজ আর আমার রক্ষা নেই! সে ভয়ে ভয়ে বসন্তসেনাকে বলল, 'ঠাকরুণ আমাকে সম্প্রতি আশ্রয় দিয়েছেন, সে সংবাদ আর গোপন নেই দেখছি। আড্ডাধারী আর তার স্যাঙাত ঠিক এসে উপস্থিত হয়েছে। সন্ধান পেয়েই গেছে আমার। আর রক্ষা নেই।' শেষের কথাগুলি যেন সে নিজেকে লক্ষ্য করেই বলল।

বসন্তসেনা তাকে অভয় দিয়ে বললো, 'অত বিচলিত হবেন না। আমি ব্যবস্থা করছি।' বলে মদনিকার দিকে ফিরে বললো, দেখ্‌, মদনিকা! বাসা-গাছ ভেঙে গেলে পাখীরাও ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়ায়! তুই যা! 'উনি দিলেন' এই কথা বলে সেই আড্ডাধারী আর তার স্যাঙাতকে আমার এই হাতের গহনাটা দিয়ে আয়! বলে বাঁ হাতের ভারী সোনার কঙ্কনটা খুলে নিয়ে বসন্তসেনা মদনিকার হাতে দিলো।

মদনিকা দু হাত পেতে গ্রহণ করে বলল, 'যে আজ্ঞে!'

মদনিকা গহনাটা নিয়ে বার মহলে এসে উঁচু অলিন্দের ধারে এসে দাঁড়াল। দেখল, দুজন লোক পিঠে পিঠ ঠেকিয়ে বসে ইতি ইতি তাকাচ্ছে! আর মাঝে মাঝেই বলে উঠছে, 'উচ্ছন্নে দিলে রে—সব ঠকিয়ে নিলে।'

মদনিকা মনে মনে বলল, এরাই তাহলে সেই স্যাঙাত্‌ আর আড্ডাধারী! একবার উর্ধদিকে, আবার দরজার দিকে চোখ রেখে নিজেদের মধ্যে নীচু স্বরে কথা বলছে, আর মাঝে মাঝে দুঃখের স্বরে

চেঁচিয়ে উঠছে। যা হোক। কথা কয়ে দেখি। মদনিকা জোর হাত করে নমস্কারের ভঙ্গী করে বলল, 'মহাশয় নমস্কার।'

রমণী-কণ্ঠ শুনেও মাথুর তেমন উৎসাহ পেল না। অন্য সময় হলে ভাল করে দেখত অন্ততঃ। এখন শুধু মদনিকার নমস্কারের উত্তরে বলল, 'সুখী হও।'

মদনিকা তখন জিজ্ঞেস করল: 'তোমাদের মধ্যে আড্ডাধারী কোন জন?'

মদনিকার এই জিজ্ঞাসায় মাথুরের লোভীমন চন্‌মন করে উঠল। সে ফিরে অলিন্দের দিকে তাকাল। মদনিকা দাসী হলেও অনিন্দ্য সুন্দরী তরুণী। তার তন্বী সুঠাম দেহ, একেবারে অনিন্দ্য মুখশ্রী থেকে বিস্তৃত অংশ, পরিপূর্ণ উরজ-যুগল, ক্ষীণ কটি, সুনিতম্বিনী-সবটুকুই যে কোনও পুরুষের মন-হরণ করার পক্ষে যথেষ্টর বেশী। কয়েক পলক মাথুরের লোভী চোখ দুটি যেন মদনিকার সারা দেহলেহন করল। তারপর কতকটা নিরুপায়, হতাশ স্বরে, বলে উঠল; 'কৃশোদরি। যার সনে কথা এবে কহিতেছো মনোহর বাক্যে, আমিই সেই আড্ডাধারী; যার পানে চাহিতেছো মধুর কটাক্ষে।—আমার এখন অর্থ নেই, বাছা, অন্যত্র যাও।'

মাথুরের কথা শুনে লজ্জায় রাঙা হয়ে গেল মদনিকার মুখ। পাতা রঙের গাত্রাবরণ দিয়ে তাড়াতাড়ি নিজের দেহ যথাসম্ভব আবৃত করে বলল, 'এমন কেউ কি আছে যে তোমার ধারে?'

এবার মাথুর ও তার সাঙাত দুজনেই ঘুরে বসে বলল, 'তা একজন আছে বই কি। তাতে তোমার কি?

মদনিকা অলিন্দ্যের থামে বঙ্কিম ঠায় দাঁড়িয়ে বলল, 'সে জন্যে ঠাকরুণ'—বলেই জিভ কেটে তাড়াতাড়ি—শুধরে নিয়ে বলল, 'না, না, সেই লোকটি—তোমাদের এই হাতের সোনার গহনাটি দিলেন,' বলে ছুঁড়ে দিল।

লাফিয়ে উঠে মাথুর লুফে নিল গহনাটা। এক পলক দেখেই বুঝল গহনাটা তার দশ সুবর্ণের চেয়েও অনেক বেশী দামী। খুশী

হয়ে একগাল হেসে মদনিকার দিকে তাকিয়ে চোখ ঠেরে বলল, 'ওগো। কুলের সেই সুপুত্তুরটিকে বলো গে—এ বেশ ব্যবস্থা হয়েছে। তাকে ছেড়ে দিলুম। আপাততঃ তোমাকেও ছেড়ে দিলুম। পরে দেখা হবে—অ্যাঁ ?'

মদনিকা ততক্ষণে ভেতর বাড়ীতে চলে গেছে।

মাথুর তবু কিছুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থেকে শেষে মুখ ফিরিয়ে স্যাঙাতকে বলল, 'চল। এবার রাজা পালককে নিয়ে দান ধরা যাক।'

স্যাঙাতও হেসে বললে, 'ঠিক কথা। রাজা পালকের সিংহাসন থাকবে না ওলটাবে।' দুজনেই হাঁ—হা করে হাসতে হাসতে চলে গেল।

মদনিকা ফিরে এসে বসন্তসেনাকে বলল, 'ঠাকরুণ। সেই আড্ডাধারী ও তার স্যাঙাত জুয়ারী, দুজনেই পরিতুষ্ট হয়ে চলে গেল।'

বসন্তসেনা কোমল দৃষ্টিতে তাকিয়ে ততোধিক কোমল স্বরে বললেন, 'মহাশয়। এবার তবে আপনি যান। গিয়ে আত্মীয়-স্বজনকে সান্ত্বনা করুন গে।'

সংবাহকের মনে আজ বড় বেদনা। এই অপমানের জীবনে হঠাৎই তার যেন বড়ই বিতৃষ্ণা এল। ধিক্কার এল নিজের জীবনে। মনে হল এভাবে বেঁচে থাকা যেন অর্থহীন। অথচ কি করবে সে যেন কিছুতেই স্থির করে উঠতে পারছিল না। মাথা নীচু করে ভেবেই যাচ্ছিল। বসন্তসেনার কথায় সে মুখ তুলে তাকাল। তার মুখভাবে তখন এক অপার্থিব জ্যোতির আভা। যেন মুহূর্তেই সে তার ভবিষ্যৎ স্থির করে ফেলেছে। বসন্তসেনার দিকে তাকিয়ে জোর হাতে প্রণাম করে সে বলল, 'ঠাকরুণ ফিরে যাবার মত কোন গৃহ আমার নেই, নেই কোন আত্মীয় পরিজন। থাকলেও হয়তো যেতে পারতাম না। জুয়া খেলার এই অপমান—বলতে বলতে থেমে গিয়ে পরক্ষণেই সে বলে উঠল, 'ঠাকরুণ, আমি বৌদ্ধ পরিব্রাজক হব বলে স্থির করেছি। এই কথাগুলি ঠাকরুণ দয়া করে মনে রাখবেন যে এই জুয়ারী

সংবাহক, যাকে আপনি নতুন প্রাণ দিয়েছেন, যে আজ থেকে বুদ্ধের পথেই যাত্রা করেছে। আমি এখনই কোন বৌদ্ধ সংঘে গিয়ে নিজেকে সমর্পিত করব। আপনাকে শত কোটি প্রণাম।'

বসন্তসেনা তবুও বললেন, 'মহাশয়। এত হতাশ হচ্ছেন কেন?'

'না ঠাকরুণ। হতাশ হই নি। বরং আপনার কাছে এসে নতুন প্রাণ পেয়েছি। তাই মনও স্থির করে ফেলেছি। এই অধীনকে স্মরণ রাখবেন, ঠাকরুণ। প্রণাম।'

কথাগুলি বলে সংবাহক নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

বসন্তসেনা অপলক চোখে সংবাহকের নিষ্ক্রমণ দেখতে দেখতে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর কতকটা নিজের মনেই বলে উঠল, 'কত সহজে সব ত্যাগ করে চলে গেল ছেলেটা।'



একজন দাস চারুদত্তের শয়নকক্ষের বাইরে অলিন্দে বসে ঘুমের ঘোরে ঢলে ঢলে পড়ছিল, আবার পরক্ষণেই সোজা হয়ে বসছিল। আর নিজের মনেই বিড়্‌বিড়্‌ করে বক্‌ছিল—'কতক্ষণ হল চারুদত্ত মশায় গীত-বাদ্য শুনতে গেচেন, রাত হয়ে গেল অর্ধেক, তবু এখনও এলেন না। ওদিকে গিন্নি ঠাকরুণ তো ছেলে নিয়ে শুয়ে পড়েছেন। আমি আর কতক্ষণ বসে থাকব। দুর ছাই। আমি বার-দরজার দালানে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। মনে হতেই উঠে বসল সে। দু'হাত ওপরে তুলে লম্বা হাই তুলে দেহের আড়মোড়া ভাঙ্গল। তারপর বার-দালানে গিয়ে শুয়ে পড়ল।

দাস যখন শুয়ে পড়ল তখন চারুদত্ত এবং মৈত্রেয় গৃহের দিকেই ফিরছিলেন। চারুদত্ত প্রায় আত্মমগ্ন স্বরে বলছিলেন সখা মৈত্রেয়কে।—'আহা। আহা। 'রেভিল' কি চমৎকার গান গাইলে। আর তাঁর বীণ-বাদ্য। আহা। প্রেমিকের প্রেমানল আরো উদ্দীপন করে; প্রেয়সী বিরহাতুর উৎকণ্ঠিত প্রণয়ীজনের হৃদি বেদনাও জুড়িয়ে দেয়। সঙ্গীত পণ্ডিত রেভিলের সত্যিই কোন তুলনা নেই। আর, তাঁর বীণা যন্ত্রটিও অসমুদ্রোৎপন্ন রত্নবিশেষ। আহা!'

চারুদত্তের উচ্ছ্বাসে বাধা দিয়ে মৈত্রেয় বলে উঠল, দুটো জিনিষে আমার বড্ড হাসি পেয়ে যায়।'

'কিরকম?' চারুদত্ত কিছুটা অন্যমনস্কভাবে বললেন।

'এই ধর, স্ত্রীলোকের সংস্কৃত পাঠ; আর জোয়ান পুরুষ মানুষের মিহি সুরে গান গাওয়া। তুমি লক্ষ্য করে দেখো, স্ত্রীলোকেরা

যখন সংস্কৃত পাঠ করে, তখন নতুন নাকে দড়ি দেওয়া গরুর মত ক্রমাগত 'ফুসফুস' শব্দ করতে থাকে ; আর পুরুষও যখন মিহিস্বরে গান ধরে, ঠিক যেন শুকনো ফুলের মালা পরে কোন বৃদ্ধ পুরোহিত মিন্‌মিনিয়ে মন্তর পড়ছে বলে মনে হয়।'

চারুদত্ত মৈত্রেয়র বলার ঢঙে হেসে ফেললেন, 'বুঝেছি, সখা! রেভিলের গানে-বাজনায় তোমার মন ভরেনি। আমার চিত্ত কিন্তু কানায় কানায় ভরে গেছে। তা থাক। গৃহে এসে পড়েছি। বর্দ্ধমানক বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে। ডাকো! দরজা খুলে দিক!'

একবার ডাকতেই বর্ধমানক ঘুম চোখে এসে দরজা খুলে দিল। তারপর দুজনের হাতমুখ প্রক্ষালনের জন্য জল এনে দিল। একটু পরে চারুদত্ত এবং মৈত্রেয়র সামনে একবাটি করে দুধ আর কিছু পরিমাণ মিষ্টান্ন এনে দিল। তারপর মৈত্রেয়র পায়ের কাছে লাল চেলি-কাপড়ে বাঁধা গহনার পুঁটলিটা রেখে দিয়ে বলল, 'মৈত্রেয়-মশায়! এই নিন, সোনার গহনাগুলো দিনে আমার আর রাত্রে আপনার জিম্মে! এই রইল। আমি ঘুমুতে গেলাম।' বলে বর্ধমানক চলে গেলো।

মৈত্রেয় দুধের বাটিতে চুমুক দিতে দিতেই অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে গহনা-গুলির দিকে তাকাল। তারপর বলে উঠল, 'এগুলো এখনো রয়ে গেছে দেখছি। উজ্জয়িনীতে কি কোনও চোর নেই যে আমার এই নিদ্রা চোরগুলিকে চুরি করে নিয়ে যায়?' তারপর চারুদত্তের দিকে ফিরে বলল, 'সখা! তুমি এগুলো অন্তঃপুরে নিয়ে যাও।'

'না হে না,' চারুদত্ত বললেন, 'অপরের জিনিষ অন্তঃপুরে না নেওয়াই ভাল। ফেরৎ না দেওয়া পর্য্যন্ত তোমার কাছেই রাখ এগুলি।' বলে উঠে দাঁড়ালেন। 'আমি ঘুমুতে চললাম। তুমিও শুয়ে পড়, সখা!' চারুদত্ত অন্তঃপুরে চলে গেলেন।

মৈত্রেয়ও হাতমুখ ধুয়ে অলিন্দের কোনার ঘরে তার নির্দিষ্ট খাটে গিয়ে শুয়ে পড়ল। উদ্যানের দিকে এই ঘর। বেশ হাওয়া-বাতাস খেলে যায়। দরজায় হুড়কো দিয়ে, গহনার পুঁটলিটা

মাথার কাছে নিয়ে শোয়া মাত্রই ঘুমের কোলে ঢলে পড়ল সে।

খানিক দূরে, নগররক্ষী সদর থেকে ঘণ্টা ধ্বনি করে রাত্রির তৃতীয় প্রহর ঘোষণা করল। নীলাকাশের বুকে শশাঙ্কদেব অস্তোম্মুখ।

সেই সময় একজন লোক নিঃশব্দে চারুদত্তের গৃহের সীমানা প্রাচীরের ধারে এসে দাঁড়াল। চারপাশ ভাল করে দেখে নিয়ে হাতে খন্তা দিয়ে সিঁধ কাটতে লাগল। আর অস্পষ্ট গুঞ্জন করে মন্ত্র আওড়াতে লাগল। মানুষ গলে যাবার মত সিঁধ কাটা হতেই শুয়ে পড়ে উদ্যানের ভেতর ঢুকে পড়ল সে। আবার চারপাশে ভাল করে দেখে নিল। তারপর সতর্ক পদসঞ্চারে ঘরের বাইরের দেওয়ালের কাছে এসে দাঁড়াল। তারপর অন্ধকারেই দেওয়াল হাতড়ে মনে মনে খুশি হয়ে উঠল। ক্রমে চোখ সয়ে গেল। বুঝল যে ক্রমাগত রোদে পুড়ে আর জলে ভিজে ঘরের দেয়াল খারাপ হয়ে গেছে, লোনা ধরেছে, ইঁদুরেও মাটি তুলেছে। মনে মনেই বলল সে—'ভ্যালা মোর বাপ। এই বারেই কার্য্যসিদ্ধি! কুমার কার্তিকের শিষ্য চোরদের এইবারই কার্য্যসিদ্ধি! এখন কিরকম সিঁধ কাটা যায়? কার্তিক ঠাকুর তো সিঁধকাটার চাররকম উপায় দেখিয়ে দিয়েছেন। যেমন, ঝামা ইঁট ঠেলে তোলা, আমাইঁট ছেদন করা, মাটির দেওয়ালে জল ঢালা, কাঠের দেওয়াল কেটে ফেলা। এ তো দেখা যাচ্ছে ঝামা-ইঁট। কাজেই টেনে তুলতে হবে। তাহলে কি রকম আকারের ছিদ্র করা যায়? স্বস্তিক কলসি? ঠিক। এই ঝামা-ইঁটে কলসির আকারের সিঁধই ঠিক খাটবে। মনে মনে স্থির করেই সে ট্যাঁকে হাত দিল। এই যাঃ! মাপবার সুতোটা তো ভুলে এসেছি। তাহলে? তখনই গলায় ঝুলোনো পৈতেতে হাত পড়ল। এই তো, এই যজ্ঞোপবীতই এখন মাপবার সুতো হবে। যজ্ঞোপবীত ব্রাহ্মণের অনেক কাজে লাগে—বিশেষতঃ, আমার মত ব্রাহ্মণের।' বলে নিজের মনেই হাসল সে।

তারপর মাপজোক করে কাজে লেগে গেলো। ক্রমে ক্রমে দেয়ালে কলসির আকারের ছিদ্র হয়ে গেল। এইবার তবে ঢোকা

যাক। তার আগে পরীক্ষা করা দরকার। ঘরে যদি কেউ জেগে থাকে? লাঠির মাথায় ন্যাকড়ার তৈরী একটা মানুষের মাথা আগে ঘরে ঢুকিয়ে দিল সে। কোন সাড়া শব্দ নেই। তখন সাহস করে নিজের মাথাটা ঢুকিয়ে দিল। তারপর দেহ। একজন অকাতরে ঘুমুচ্ছে। ঘরের চারপাশ দেখে নিয়ে মনে মনে বলল, দরজাটা খুলে রাখা যাক। বেগতিক দেখলে পালাতে তো হবে। এগিয়ে গিয়ে দরজার হুড়কো খুলে বাইরে গিয়ে সদর দরজাটাও খুলে দিল। তারপর ফিরে এল ঘরে। তারপর ঘুমন্ত লোকটাকে নানাভাবে পরীক্ষা করল। নাঃ। সত্যিই ঘুমোচ্ছে লোকটা। কিন্তু ঘরে তো কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না! এহ্! এত বড় বাড়ীর লোকদের এমন হৃতদরিদ্র অবস্থা! ভাবা যায় না। কেবল মৃদঙ্গ, দর্দুর, ভেরী, বীণা, বাঁশী, আর কিছু পুস্তক। কোন নাট্যাচার্যের বাড়ী নাকি? নাকি টাকাকড়ি সব রাজার ভয়ে বা চোরের ভয়ে মাটির ভেতর পুঁতে রেখেছে? আমি শর্বিলক শর্মা। মাটিতে পোঁতা ধন—সেও তো আমারই! বীজ ফেলে দেখি তো!—কোমরের গেঁজে থেকে কিছু বীজ ফেলে পরীক্ষা করল। নাঃ। বীজ পড়ে তো ফুলে উঠল না। তবে তো দেখছি লোকটা নিতান্তই দরিদ্র। নাঃ। পরিশ্রমটাই মাটি। এইসব যখন মনে মনে ভাবছে সে তখনই ঘুমন্ত মৈত্রেয়, বুঝি স্বপ্নের ঘোরেই কথা কয়ে উঠল। চমকে উঠে শর্বিলক দুপা পিছিয়ে গেল।

'দেখ সখা। সিঁধ দেখা যাচ্ছে। চোর এসেছে। এই স্বর্ণ অলঙ্কারগুলি তুমি রাখো।'

শর্বিলক নামে চোর চোখ বড় বড় করে ঘুমন্ত মৈত্রেয়র দিকে তাকালো।

দরিদ্রের বাড়িতে প্রবেশ করেচি বলে আমাকে কি উপহাস করচে? তবে কি একে যমালয়ে পাঠাবো? নাকি স্বপ্নের মধ্যে ভুল বকছে? ভাবতে ভাবতেই চোখ পড়ল তার পুঁটলিটার দিকে। আরে! অন্ধকারেও ঝক্‌মক্ করচে! সত্যিই স্বর্ণ অলঙ্কার নাকি!

সর্তক পায়ে গিয়ে শর্বিলক পুঁটলিটা তুলে নিল। পাতলা লাল চেলিতে বাঁধা। তাই গহনাগুলো দেখা যাচ্ছে। স্বর্ণ গহনাই বটে! খুশীতে তার মন নেচে উঠল।—'এবার তবে যাই।'

তখনই মৈত্রেয় আবার স্বপ্নের ঘোরে কথা কয়ে উঠল: 'সখা! এই অলঙ্কারগুলো যদি না নাও, তোমার গো-ব্রাহ্মণের দিব্যি লাগবে।'

ভয় পেয়ে শর্বিলক ট্যাক থেকে এক টুকরো ন্যাকড়ায় বাঁধা পোকাগুলো বার করে জ্বলন্ত প্রদীপের ওপর ছেড়ে দিল। পোকা-গুলো উড়তে উড়তে ডানার ঝাপটায় প্রদীপটা নিবিয়ে দিল। ঘরের মধ্যে তখন ঘোর অন্ধকার।

'নিয়েছ সখা! অলঙ্কারগুলো?' মৈত্রেয় ঘুমের ঘোরে আবার বলে উঠল।

শর্বিলক চোরও গলাটা যথাসম্ভব কোমল করে বলল, 'গো-ব্রাহ্মণের দিব্যি তো অলঙ্ঘণীয়—তাই নিলাম।'

'আহ। জিনিস বিক্রি হয়ে গেলে বণিক যেমন সুখে নিদ্রা যায় এখন আমিও তেমনই সুখে নিদ্রা যাই।' মৈত্রেয় গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল আবার।

শর্বিলক কিছুটা বিদ্রুপের স্বরে বলল, 'ওগো মহাব্রাহ্মণ! তুমি এখন শতবর্ষ ধরে নিদ্রা যাও। কোন আপত্তি নেই আমার।' বলেই দরজার দিকে ফিরল। কি ঘোর অন্ধকার! হঠাৎই শর্বিলকের মনে হল, আমি এই অন্ধকারে চোর হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি? আমি, চতুর্বেদবেত্তা—অপ্রতিগ্রাহক ব্রাহ্মণ সন্তান, সেই আমি আজ রূপাজীবা মদনিকার জন্য এই নীচকার্যে প্রবৃত্ত হয়েছি? হায়! সমস্ত ব্রাহ্মণ কুলকেই নরকে ডোবালাম। নাকি নিজেই নরকে ডুবলাম? থাক গে। এখন মদনিকার দাসত্বমোচন করতে হবে। বসন্তসেনার বাড়ীতে এখনই যাওয়া দরকার।

ভাবামাত্রই দরজা দিয়ে বেরিয়ে অলিন্দ পার হয়ে সদর পেরিয়ে দুপা না যেতেই কার সঙ্গে ধাক্কা খেল। 'কে, কে, কে?'

আরে! এ যে মহিলার গলা! শর্বিলক বুঝতে পেরেই দৌড় দিল।

আসলে, মহিলা রদনিকা, চারুদত্তের দাসী। ছুটি নিয়ে মায়ের সঙ্গে দেখা করে ফিরছিল। কিছু আশঙ্কা করে দৌড়ে সদর দরজার কাছে এসে দেখে দরজা খোলা। বা'র দালানে তো বর্ধমানকের শুয়ে থাকার কথা! দেখা যাচ্ছে না তাকে। মৈত্রেয়-মশাইকে ডাকি। ভেবেই চেঁচিয়ে উঠল রদনিকা: 'মৈত্রেয় মশাই! উঠুন, উঠুন! ঘরে সিঁধ কেটে চোর পালিয়ে গেল যে!'

তার চিৎকারে ধড়্‌মড়্‌ করে উঠে বসলো মৈত্রেয়—'বলিস্ কি রে, বেটি! কোথায়, কোথায়?' বলতে বলতেই দৃষ্টি পড়ল দেয়ালে কলসি আকারের ছিদ্রে।—তাইতো! সিঁধই বটে! সখা! সখা!' বলে চারুদত্তকে ডাকল।

হন্তদন্ত হয়ে চারুদত্ত চোখ মুছতে মুছতে এলেন, 'কি পরিহাস করছ এত রাতে বলতো মৈত্রেয়?' বলতে বলতে চোখ পড়ল দেয়ালে। চারুদত্ত আরও দুপা এগিয়ে এলেন! সিঁধকাটা দেখে মুগ্ধতার স্বরে বলে উঠলেন, 'মৈত্রেয়! দেখো! কি চমৎকার দক্ষতা দেখিয়েছে সিঁধ কাটায়! তবে এই চোর হয় শিক্ষার্থী না হয়তো নবাগন্তুক। নইলে উজ্জয়িনী নগরে আমাদের আর্থিক অবস্থার কথা কে না জানে? বেচারা হয়তো গল্প করবে নিজেদের মধ্যে এত বড় বণিকের বাড়ী গিয়ে কিছুই পেলাম না।'

'তোমার কি চোর ব্যাটার ওপর খুব দয়া হচ্ছে না কি?' মৈত্রেয় একটু পরিহাস করেই বলল, 'তা থাকলে তোমাকে তখন যে অলঙ্কার-গুলি দিলাম সেগুলি ঠিকমত রেখেছো তো?'

চারুদত্ত অবাক হয়ে বললেন, 'তুমি আবার কখন আমাকে অলঙ্কার দিলে?'

'দেখ সখা! তুমি সব সময়ই বল, "মৈত্রেয়টা মুর্খ, 'মৈত্রেয়টা নির্বোধ!" কিন্তু দেখো, আমি যদি তখন অলঙ্কারের পুঁটলিটা তোমার হাতে না দিয়ে দিতাম, তাহলে সেগুলি তো চোরে নিয়েই যেতো?

'আমার হাতে তুমি কখন দিলে?' চারুদত্ত আরও অবাক হয়ে

বললেন ?

'হ্যাঁ, দিলাম ! তোমাকে গো-ব্রাহ্মণের দিব্যি দিলাম !' মৈত্রেয় জোর দিয়ে বলল।

'না, না, তা কি করে হবে।' বলতে গিয়েই চকিতে বিদ্যুতের মত কথাটা খেলে গেল চারুদত্তের মাথায়! তিনি প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'সখা ? তুমি সেই বসন্তসেনার অলঙ্কারগুলির কথা বলছ না তো ?'

'তবে আর বলছি কি ? সেগুলিই তো।' মৈত্রেয় বলতে বলতেই—চারুদত্তের পাংশুবর্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে আশঙ্কায় থেমে গেল।

চারুদত্ত তখন মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছেন। 'কার্য্যসিদ্ধি করেই গেছে চোর!'

সখা চারুদত্তের অবস্থা দেখে মৈত্রেয় সান্ত্বনার স্বরে বলল, 'সখা! তুমি শান্ত হও। গচ্ছিত বস্তু যদি চোরে নিয়েই যায় তবে তোমার আর কি করার আছে ? আর আমি অস্বীকার করব—কে নিয়েছে, কাকে দিয়েছে বসন্তসেনা! আমরা কিচ্ছু জানি না! কে সাক্ষী আছে ?'

চারুদত্ত কেবল ক্ষীণ স্বরে বললেন, 'আমি কি তবে মিথ্যে বলব ?'

এতক্ষণ আড়ালে থেকে চারুদত্ত গৃহিণী ধূতা দেবী সব শুনছিলেন। এবার তিনি স্বামীর কলঙ্ক ঘোচাতে মাতৃগৃহ থেকে পাওয়া অতি মূল্যবান একটি রত্ন-হার এনে মৈত্রেয়কে বললেন, 'মৈত্রেয় মহাশয়! আমি রত্ন-ষষ্ঠী ব্রত নিয়েছি। তাতে, যার যেমন শক্তি রত্নদান করতে হয়। একজন ব্রাহ্মণকে এটি দিতে চেয়েছি। তিনি নেননি। আপনি তাঁর হয়ে এটি গ্রহণ করুন!' বলে সেই রত্নহারটি, অতি দারিদ্রে থেকেও যাতে চারুদত্ত হাত দিতে চাননি, সেটি ধূতা দেবী মৈত্রেয়র হাতে দিলেন। মৈত্রেয় গ্রহণ করল দুহাতের অঞ্জলী পেতে।

'কল্যাণ হোক! জয় হোক তোমার!' মৈত্রেয় সোৎসাহে বলে উঠল। ধূতা দেবী অন্তঃপুরে চলে গেলে সখা চারুদত্তের দিকে

তাকালো। চারুদত্ত এতক্ষণ অধোবদনে একপাশে দাঁড়িয়েছিলেন। মৈত্রেয় বলল, 'সখা! তুমি সত্যিই ভাগ্যবান! এমন স্ত্রী রত্ন সকলের ভাগ্যে লেখে না।'

চারুদত্ত মুখ তুলে একটি দীর্ঘশ্বাস মোচন করলেন। তারপর গম্ভীর স্বরে বললেন, 'মৈত্রেয়! এইবার তবে যাও! এই রত্নমালাটি নিয়ে বসন্তসেনাকে গিয়ে বল যে "তোমার সেই স্বর্ণ-অলঙ্কারগুলি নিজের মনে করে আমি দ্যুত-ক্রীড়ায় হারিয়েছি। তার পরিবর্তে এই রত্ন গ্রহণ করে আমাকে দায় মুক্ত কর।" আমার এই কথাগুলি বলে দিও স্পষ্ট করে।'

মৈত্রেয় অবাক বিস্ময়ে সখা চারুদত্তের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি বলছ কি, সখা? কয়েকটা তুচ্ছ অলঙ্কারের পরিবর্তে চতুঃসাগরের সারভূত এই রত্নমালাটি দিয়ে দেবে?'

'ও কথা বলো না সখা।' চারুদত্ত দৃঢ় স্বরে বললেন, 'বিশ্বাস করে অলঙ্কারগুলি আমার কাছে সে রেখেছিল। আমি সেই বিশ্বাসের ধার শোধ করছি মাত্র।'

মৈত্রেয় আর কোন কথাই বলতে পারল না। মাথা নীচু করে ধীরে ধীরে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল!

  

নিজের ঘরে বসেই বসন্তসেনা আর মদনিকা কথা বলছিল। মদনিকা তো কেবল দাসী নয়, সখীও বটে বসন্তসেনার। চারুদত্ত মশাইয়ের একটি চিত্রফলক বসন্তসেনার সামনে। সেদিকে তাকিয়েই ও বলল, 'মদনিকা! চিত্রটা ঠিক দত্তমশায়েরই মত হয়েছে?'

'একদম ঠিক হয়েছে।' মদনিকা বলল।

'ঠিক হয়েছে? কি করে জানলি? তুই তো দত্তমশায়কে তেমনভাবে কখনও দেখিস নি?' বসন্তসেনা রাগের ভান করে বলল।

মদনিকাও তো তার সখীকে চেনে। সে হেসে ফেলল। তারপর ভ্রূভঙ্গী করে বলল, 'ঠাকরুণ একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখছেন, দুচোখ থেকে ভালবাসা ঝরে পড়ছে। কাজেই—'

'আহা! আমাদের আবার ভালবাসা কি না?' বসন্তসেনা মদনিকার গালে ঠোনা মেরে হাসল।

মদনিকা কিন্তু অত সহজে রসিকতাটুকু মেনে নিতে পারল না। তার মানস-পটে শর্বিলকের মুগ্ধ মুখচ্ছবি ভেসে উঠল। চেষ্টা সত্ত্বেও গলার স্বরে গাঢ়তা এসে গেলই। '—কেন ঠাকরুণ? আমাদের মত যারা, তাদের কি সব সময়েই কপট ভালবাসা?'

বসন্তসেনা অতশত না বুঝে হাল্‌কা ভাবেই বলল, 'ওলো মদনিকে, জানিস্ তো আমাদের নানা পুরুষের সংসর্গ করতে হয়, তাদের কপট-ভালবাসাও দেখাতে হয়।'

এই সময় একজন দাসী এসে বলল, মা-ঠাকরণ আজ্ঞা করচেন যে খিড়কির দরজায় গাড়ি এসেছে। আপনি ঘোম্‌টা দিয়ে সেখানে যান।'

কথাগুলি শুনেই উৎফুল্ল হয়ে বসন্তসেনা উঠে দাঁড়াল। 'তবে কি চারুদত্ত মশায় গাড়ি পাঠিয়েছেন আমাকে নিয়ে যাবার জন্য?'

দাসী সোজা উত্তরটা এড়িয়ে গিয়ে বলল, 'ঠাকরণ! গাড়ীতে দশ সহস্র স্বুবর্ণ-মূল্যের অলঙ্কারও পাঠিয়েছেন তিনি।'

'কার কথা বলছিস্ তুই? কে পাঠিয়েছে?'

বসন্তসেনার কথার ধমকে একটু ইতঃস্তত করে দাসী বলল, 'আজ্ঞে, রাজার শালা সংস্থানক!'

শুনেই ক্রোধে আরক্তিম হয়ে গেল বসন্তসেনা! দাসীকেই ভর্ৎসনা করে বলল, 'দূর হ তুই। আমার সামনে ওই নাম আর উচ্চারণ করবি না। যা!'

বসন্তসেনার রাগ দেখে দাসী স্তিমিত স্বরে বলল, 'মা ঠাকরণকে তাহলে কি বলব বলুন?'

'বলবি, 'আমি বেঁচে থাকি, এই যদি তাঁর মনে থাকে তাহলে মা যেন আর কখনও এমন কথা আমাকে বলে না পাঠান!' বলে প্রচণ্ড ভাবাবেগে উদ্বেলিত বসন্তসেনা বেতস পত্রের মত কাঁপতে কাঁপতে মদনিকাকে বলে, 'ছাখ! এই চিত্র-ফলকটা আমার শোবার

ঘরে রেখে দিয়ে এক্ষুনি একটা পাখা নিয়ে আয়! আমার ভীষণ শরীর খারাপ বোধ হচ্ছে।'

মদনিকা তৎক্ষণাৎ চিত্রফলকটা নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। 'আমি এক্ষুনি আসছি, ঠাকরুণ।'

  

শর্বিলক দৃষ্টি এড়িয়ে, খিড়কির দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ল। বেশ কয়েকটি মহলে বিভক্ত বসন্তসেনার বাড়ী। প্রতিটি মহলই বিভিন্ন ভাবে সুসজ্জিত। প্রথমটা একটু বিভ্রান্তই হল শর্বিলক। এদিকটায় অবশ্য উদ্যান। সামনেই স্তম্ভ শোভিত গোলাকৃতি অলিন্দ। সঙ্গে বিশ্রামালাপ-গৃহ। এখন মদনিকাকে কোথায় কি ভাবে পাওয়া যাবে! ভাবচে শর্বিলক। তখনই ভেতর দিক থেকে মদনিকাকে আসতে দেখা গেল। মুগ্ধ দৃষ্টে তাকিয়ে রইল শর্বিলক। আহা! বিমোহিনী মূর্তিমতী রতি! অনঙ্গ তাপিত হৃদয় আমার শীতল হয়ে গেল!—ওকি! এ যে অন্যদিকে চলে যাচ্ছে! শর্বিলক ছুটে গিয়ে চাপাস্বরে ডাকল, 'মদনিকে!'

ডাক শুনে চমকে ফিরে তাকাল মদনিকা। শর্বিলককে দেখেই এগিয়ে এল। 'ওমা! শর্বিলক?' বলেই ছুটে এল মদনিকা। শর্বিলকের বুকের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কয়েক মুহূর্ত সে ভাবে থেকে তারপর মুখ তুলে বলল, 'কোথ্ থেকে এলে? কখন এলে?'

শর্বিলক মুগ্ধ দৃষ্টি মদনিকার চোখের ওপর রেখেই বলল, 'এইমাত্র এসেছি। একটা কথা বলব।'

মদনিকা শর্বিলকের দিকে প্রেমমুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, 'কি কথা? বল না।'

ওদিকে তখন বসন্তসেনা মদনিকার আসতে দেরী হচ্ছে দেখে নিজেই উঠে এল। হঠাৎ নারী পুরুষের কথা কানে যেতে একটা স্তম্ভের আড়ালে দাঁড়িয়ে পড়ল। অল্প ঝুঁকে দেখল—মদনিকা অনুরাগ ভরা দৃষ্টিতে এক রূপবান, বলশালী যুবকের দিকে তাকিয়ে আছে। যুবকও। যুবকের পরনের পোষাক যদিও দারিদ্রের চিহ্ন বহন করছে।

মনে পড়ল বসন্তসেনার। এই যুবকই মদনিকার দাসত্বমোচন করতে ইচ্ছুক হয়ে ওর কাছে একদিন এসেছিল। মদনিকাই নিয়ে এসেছিল। আচ্ছা! ভালবাসা! প্রাণ ঢেলে ভালবাস মদনিকা! তাহলেই আমার অবস্থাও বুঝবি। মদনিকাকে আর ডাকবে না—ভাবল ও। কারও প্রেমে আঘাত করতে ইচ্ছে হল না ওর। কিন্তু, কি যেন বলছে যুবক! আমার নামটাও শুনতে পাচ্ছি? অনিচ্ছাসত্ত্বেও কান পাতল ও।

শর্বিলক তখন বলছিল, 'মদনিকে! উপযুক্ত মূল্য দিলে বসন্তসেনা ঠাকরুণ তোমাকে দাসত্ব থেকে কি মুক্তি দেবেন মনে হয়?'

মদনিকা বলল, 'জিজ্ঞেস করতে তো উনি বললেন যে ওঁর ইচ্ছে হলে সব দাসীরই বিনামূল্যে দাসত্ব মোচন করতে পারেন। তা, তোমার কি এমন সঙ্গতি আছে যে মূল্য দিয়ে আমাকে কিনে নেবে?'

মদনিকার একথায় একটু আহত বোধ করলেও গায়ে মাখল না শর্বিলক। চাদরের আড়াল থেকে অলঙ্কারের পুঁটলিটা বার করে মদনিকাকে দেখাল।

মদনিকা সাগ্রহে পুঁটলি খুলে অলঙ্কারগুলি দেখল। কপালে তার চিন্তার রেখা দেখা দিল। মুখ তুলে সে শর্বিলককে বলল, 'অলঙ্কার-গুলো আগে কোথাও দেখেছি মনে হচ্ছে! কোথ্ থেকে পেলে, বল তো?'

'তা জেনে তোমার কি হবে?' উদাসীন স্বরে উত্তর দিল শর্বিলক।

তৎক্ষণাৎ দু'হাত দূরে সরে গেল মদনিকা! সরোষে বলল,—'আমাকে যদি বিশ্বাসই না হয়, তবে আমার মত একজন তুচ্ছ স্ত্রীলোককে মূল্য দিয়ে কিনতে যাচ্চো কেন?'

শর্বিলক এগিয়ে গিয়ে মদনিকাকে দুহাত দিয়ে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে গাঢ় চুম্বন এঁকে দিল তার কমল সদৃশ ওষ্ঠে।—'অমন করে আর বলোনা মদনিকে। তুমি তুচ্ছ আমার কাছে। আর তোমাকে অবিশ্বাস করার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। শোন! বণিক-পটিতে আজ সকালে গিয়ে শুনলাম যে এই অলঙ্কারগুলি চারুদত্ত মশায়ের!'

ততক্ষণে মনে পড়ে গেছে মদনিকার। সে গম্ভীর স্বরে বলল, 'না। এগুলি চারুদত্ত মশায়েরও নয়। অলঙ্কারগুলি আমাদের ঠাকরুণের।'

'বল কি? অন্য হাতে কি করে গেল?' শর্বিলক অবাক হয়ে প্রশ্ন করল।

'ওনার কাছে গচ্ছিত রাখা হয়েছিল।' মদনিকা বলল।

'কেন? ওঁর কাছে কেন্?'

মদনিকা তার চারুমুখ শর্বিলকের কানের কাছে এনে কিছু বলল, 'এই জন্যে? বুঝলে?'

'ইস্! ছি! ছি! যে গাছ ছায়া দেয়, সে গাছের ডালই কেটে ফেললাম!' অনুতপ্ত স্বরেই শর্বিলক বলে উঠল।—'এখন কি করা যায় বল দিকি?'

'আমার মতে অলঙ্কারগুলি সেই মহাত্মাকেই ফিরিয়ে দাও!'

শর্বিলক মাথা নেড়ে বলল 'ফিরিয়ে দিলে যদি রাজ-দরবারে আমার নামে নালিশ করে দেন? না, না, অন্য উপায় থাকে তো বল!'

কিছুক্ষণ ভাবল মদনিকা। তারপর বলল, 'এক কাজ কর। এই অলঙ্কারগুলি আমাদের ঠাকরুণকেই ফিরিয়ে দিয়ে বল যে চারুদত্ত মশায় তোমার হাত দিয়ে এগুলো পাঠিয়েছেন।'

'তাতে কি হবে?—'

'তুমিও চোর হবে না, চারুদত্ত মশায়ও ঋণ মুক্ত হবেন। আর ঠাকরুণও নিজের অলঙ্কারগুলি ফিরে পাবেন।'

শর্বিলক ইতস্ততঃ করতে লাগল। 'না, না, এ আবার তুমি অতি সাহসের কথা বলছ।'

মদনিকা একটু কঠোর স্বরেই বলল, 'শর্বিলক! আমার কথা শোনো! অলঙ্কারগুলি ঠাকরুণকে দিয়ে দাও। না দিলেই বরং দুঃসাহসের কাজ হবে। বিপদে পড়বে শেষে!'

শর্বিলক মাথা নীচু করে খানিকক্ষণ ভাবল। তারপর একটা—

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'বেশ! তাই হোক। চল যাই।'

বসন্তসেনা সব কথাই শুনল দুজনের। স্তম্ভের আড়াল থেকে দূরে, ভেতর দিকে যেতে যেতে মনে মনে মদনিকার প্রশংসা করল। বেশ বুদ্ধিমতীর মত বলেছে।

মদনিকাকে এগিয়ে আসতে দেখে কিঞ্চিৎ অভিনয় করে বসন্তসেনা বলল, 'কিরে। পাখা আনতে তোর এতক্ষণ?'

মদদিকা লজ্জিত স্বরে বলল, 'এইখানে ঠাকরুণ। চারুদত্তের কাছ থেকে এক ব্রাহ্মণ এসেছে, তাই—।'

বসন্তসেনা হাসি গোপন করে বলল, 'তাই বুঝি? তা তাঁর কাছ থেকে এসেছে, তুই কি করে জানলি?'

মদনিকা লজ্জায় রাঙা হয়ে হয়ে বলল, 'ঠাকরুণ! আমার আপনার লোককে কি আর আমি জানি না।'

বসন্তসেনা মুচ্‌কি হেসে বলল, 'তা বটে! আচ্ছা! যা এখানে নিয়ে আয়!'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মদনিকার পেছনে শর্বিলক প্রবেশ করতেই বসন্তমেলা উঠে হাত জোড় করে বলল, 'মহাশয় প্রণাম! বসতে আজ্ঞা হোক!'

শর্বিলক পালাতে পারলে বাঁচে, বসবে কি! সে তাড়াতাড়ি পুঁটলিটা মদনিকার হাতে ধরিয়ে দিয়ে হড়বড় করে বলে গেল: 'বণিক চারুদত্ত একথা আমাকে বলতে বলেছেন যে তাঁর গৃহ তো অতি জীর্ণ পুরাতন, সেখানে এই অলঙ্কারগুলি বেশীদিন রাখা নিরাপদ নয়, তাই আপনি এগুলি গ্রহণ করুন!'

বসন্তসেনা রহস্যময় হাসি হেসে বলল, 'মহাশয়! প্রত্যুত্তরে আমারও কিছু নিবেদন আছে!'

বসন্তসেনার কথা শুনে শর্বিলক ফাঁপরে পড়ল। মনে মনে বলল, সেখানে যেতে বললেও আমি কিছুতেই যাচ্ছি না। তবু মুখে চেষ্টাকৃত হাসি ফুটিয়ে বলল, 'বলুন! আপনার কি নিবেদন?'

বসন্তসেনা সহাস্যে বলল, 'আপনি মদনিকাকে গ্রহণ করুন!'

শর্বিলক বিস্ময় ভরা চোখে বসন্তসেনার দিকে তাকাল। 'আপনার এ কথার অর্থ আমি বুঝতে পারছি না।'

'অর্থ আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি।' বসন্তসেনা হাসি চেপে বলল।— 'শুনুন! চারুদত্ত মহাশয় আমাকে বলে দিয়েছেন এই অলঙ্কারগুলি যে দিতে আসবে, তার হাতে যেন মদনিকাকে সমর্পণ করা হয়। এবার তো অর্থ বুঝেছেন?'

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল শর্বিলক। স্পষ্টতঃই বুঝতে পারল যে বসন্তসেনা তার সব কথাই জানেন। চারুদত্তের প্রতি কৃতজ্ঞতায় তার মন ভরে গেল।

ওদিকে বসন্তসেনা তখন লজ্জাম্লান মদনিকার আরক্ত মুখখানি তুলে ধরে বলছে, 'আমার দিকে তাকা মদনিকে। আমি তোকে— সম্প্রদান করেছি। যা! সুখে স্বামীর ঘর করিস্। আমাকে যেন ভুলে যাস্ না।'

আনন্দে, কৃতজ্ঞতায় অশ্রুতে দুচোখ ভরে গেছে তখন মদনিকার। গলার স্বর হয়ে গেছে রুদ্ধ। তবু নীচু হয়ে বসন্তসেনাকে প্রণাম করল সে।

বসন্তসেনাও একটু যা বিচলিত। মুখ ঘুরিয়ে ডাকল: শকটের বাহক কে আছে?

উত্তর এল, 'ঠাকরুণ! শকট প্রস্তুত।'

'আয় মদনিকে!' বসন্তসেনা ডাকল। মুখ ফিরিয়ে শর্বিলককেও আসতে বলল।

ঠিক সেই সময় একটা শোরগোল উঠল। প্রচণ্ড জোরে ঢোল-ঢ্যাঁড়রার আওয়াজ ভেসে এল। সেই সঙ্গে রাজাদেশ!

তিনজনেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। ঘোষকের কণ্ঠস্বর ভেসে এল: "শোন! শোন! শোন নগরবাসীগণ! রাষ্ট্রপাল এই আদেশ করছেন, "আর্যক নামে গোপাল-বালক রাজা হবেন," সিদ্ধপুরুষের এই কথায় বিশ্বাস করে ভীত হয়ে আমাদের রাজা পালক তাকে ঘোষ পল্লী থেকে ধরে এনে ঘোর কারাগারে বন্ধ করে রেখেছেন।

অতএব তোমরা স্ব স্ব স্থানে সতর্ক হয়ে থাকো।'

ঘোষণা শুনতে শুনতেই অস্থির হয়ে পড়ল শর্বিলক। আর্যক তার প্রাণের বন্ধু। শুধু তাই নয়। দেশের কাজে সর্বরকমে আর্যকের সহায়তা করবে, অত্যাচারী নীতিজ্ঞানহীন অপশাসনের ঘটাবে অবসান—এমন প্রতিজ্ঞায় সে দায়বদ্ধ। কিন্তু এখন উপায়! এই মুহূর্তেই যে সে সংসার বন্ধনে জড়িয়ে পড়ল! মদনিকাকে এখন কোথায় ছেড়ে যাবে সে! অথচ কর্তব্যের আহ্বানে সাড়া না দিয়েও তো উপায় নেই!

তার করুণ, অথচ বিচলিত মুখ দেখে বসন্তসেনা সহজেই কিছু অনুমান করে নিতে পারল। তাই প্রশ্ন করল শর্বিলককে, 'আপনাকে এত অস্থির মনে হচ্ছে কেন?'

'আপনি ঠিকই ধরেছেন দেবী!' শর্বিলক থেমে থেমে বলল, 'আমার প্রিয় সুহৃদ আর্যককে দুষ্ট রাজা বন্দী করেছেন। সর্বরকমে তাঁকে মুক্ত করার চেষ্টা আমাদের করতেই হবে। সে জন্যে, এখনই আমার যাওয়া প্রয়োজন! কিন্তু মদনিকা!—'

বসন্তসেনা স্থির প্রত্যয়ের কণ্ঠে আশ্বাস দিয়ে বলল, 'ব্রাহ্মণ! আপনি নিশ্চিন্তে যান! আর্যককে, কেবল তাঁকেই কেন, সমগ্রদেশকেই মুক্ত—করুন! ততদিন মদনিকা আমার কাছেই থাক। দাসী হয়ে নয়, আমার একান্ত বান্ধবী হয়ে। আমরা সকলেই সেই সুদিনের প্রতীক্ষায় রইলাম। সফল হয়ে ফিরে আসুন! ঈশ্বর আপনাদের সহায় হোন।'

শর্বিলক এবার নীচু হয়ে হাত জোড় করে বসন্তসেনাকে প্রণাম করল। তারপর মদনিকার দিকে তাকাল। দুচোখ ভেসে যাচ্ছে তাঁর অশ্রুজলে। তবু চোখ মুছে, মুখে হাসি ফুটিয়ে সে বলল, 'যাও! কিন্তু, সাবধানে, সতর্ক হয়ে থেকো! আর···তাড়াতাড়ি ফিরে এসো!'

শর্বিলক এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে চকিতে উধাও হয়ে গেল।

□ □ □

বসন্তসেনার বিশাল অষ্টমহলা অট্টালিকার সামনে এসে মৈত্রেয় বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেল! উজ্জয়িনীতেই জন্ম, এখানে এতদিন কাটিয়েছে মৈত্রেয়। এদিকপানে বিশেষ একটা আসা হয়নি। প্রয়োজনও হয় নি। ঠিক বাড়ীতেই এসেছে কিনা এই ভেবে ভয়ে ভয়ে বিশালবপু, সগুম্ফ দৌবারিকের কাছে এগিয়ে গিয়ে ভেতরে সংবাদ পাঠাল।

একটু পরেই অতি সুন্দরী এক অল্প বয়সী দাসী এসে আপ্যায়ন করে তাকে ভেতরে নিয়ে গেল।

মৈত্রেয় দাসীর পশ্চাতে যেতে যেতে চারপাশে সবিস্ময়ে দেখছে আর নিজের মনেই কথা বলে যাচ্ছে। বাঃ! চমৎকার! ভূমিটি কেমন জল দিয়ে ধোয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। হাতীর দাঁতের তোরণটি আকাশে মাথা তুলেছে! তা থেকে মল্লিকার মালা ঝুলছে যেন ঐরাবতের শুঁড়। লৌহ-কীলক-বদ্ধ দুর্ভেদ্য কনক-কপাটেরই বা কি শোভা!'

'মহাশয়! এদিকে আসুন! এই আমাদের প্রথম মহল!' দাসী সাদরে মৈত্রেয়কে ডাকল।

মুগ্ধ মৈত্রেয় তেমনি বিস্মিত হয়েই চারপাশে অবলোকন করতে করতে বলে যেতে লাগল: 'আহা! চাঁদের মত, শাঁখের মত,—মৃণালের মত ঝক্ঝকে চুনকাম করা ধব্ধবে প্রাসাদ, রত্ন খচিত সোনার সিঁড়ি, স্ফটিকের গবাক্ষ—যেন চাঁদ মুখ বার করে সমগ্র উজ্জয়িনী নগরটিকে দেখছে!'—হ্যাঁ গো মেয়ে! এরপর কোথায় যাব?'

দাসী বলল, 'এই তো দ্বিতীয় মহলে আসুন!'

'ও বাবা! এ কোথায় আনলে গো মেয়ে?' মৈত্রেয় চোখ বড় বড় করে দেখতে দেখতে বলল, 'স্বাস্থ্যবান বলীবর্দ সব, শিঙে তেল মাখানো হচ্ছে; ওদিকে অশ্বদের কেশ-রচনা হচ্ছে, মাহুতরা সব তেল মাখা ভাতের পিণ্ডি হাতীগুলোকে দিচ্ছে, মেষগুলোর গা' থেকে লোম কাটা হচ্ছে। কি কাণ্ডরে বাবা!'

দাসী ডাকল, 'আসুন মহাশয়! তৃতীয় মহলে আসুন!'

'এই তৃতীয় মহল! এ তো দেখছি পুস্তকাগার এবং শিল্প শালা। কেউ চিত্র অঙ্কন করছে, কেউ পুস্তক পাঠে নিরত। আবার মণিময় পাশার গুটি নিয়ে কয়েকজন খেলায় রত দেখছি! বাঃ! চমৎকার!'

দাসী বলল, 'এবার চতুর্থ মহল দেখুন!'

'এ যে দেখছি সুন্দরী যুবতীদের মেলা বসে গেছে। কেউ বাজাচ্ছে মৃদঙ্গ, কেউ বাঁশী, তালে তালে কর্তাল বাজাচ্ছে কেউ, বীণায় ঝঙ্কার তুলেছে কজন, আবার পুষ্প-মত্ত মধুকরের মত গীত নিপুনা রসিকা কুমারীরা নৃত্য করছে, গানও গাইছে। আহা! আহা!'

'মহাশয়! এদিকে আসুন! এই আমাদের পঞ্চম মহল।'

পঞ্চম মহলে পা দিয়েই বুক 'ভরে নিঃশ্বাস নিল মৈত্রেয়। 'বাঃ বাঃ! হিং-তেলের গন্ধে ম ম করছে চারদিক। কত রকম খাবার জিনিষ তৈরী হচ্ছে যে! মোয়া, পিঠে; ওদিকে আবার পর্বত প্রমাণ মাংস কষছে দুই পাচক। আমার মত দরিদ্রের যে রসনা সিক্ত হয়ে উঠছে!'

মৈত্রেয়র কথা শুনে দাসী হেসে বলল, 'এবার ষষ্ঠ মহলে আসুন, মহাশয়।'

এতক্ষণ চলা থামায়নি মৈত্রেয়। কিন্তু ষষ্ঠ মহলে পা দিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। শিল্পীরা প্রবাল, মরকত, পদ্মরাগ, ইন্দ্রনীল, কর্কেতরবা, পুষ্পরাগ প্রভৃতি মণিমাণিক্য বাছাই করছে; সোনা দিয়ে মাণিক বাঁধছে; বৈদূর্য্যমনি ধীরে ধীরে গুঁড়ো করছে, কস্তুরী পরিষ্কার করছে, চন্দন ঘষ্‌ছে; ওদিকে যুবতীরা সব কজন যুবকের সঙ্গে রঙ্গ-রসিকতা করছে, কর্পুর-মেশানো পানের গন্ধে চারদিক ভুরভুর্‌ করছে; ওদিকে কজন স্বচ্ছ স্ফটিক পাত্রে হিমশীতল জমাট-জলের টুকরো ফেলে মদ্যপানও করছে দেখছি। ওগো! এরপর আরও কি দেখার আছে?'

'এই যে, সপ্তম মহলে আসুন এবার!' দাসী আহ্বান করল।

'এ তো দেখছি পক্ষীশালা! ময়না, শালিখ, গৃহ-ময়ুর, শুকপাখী, কোকিল। দেখ! দেখ! লাওয়া পাখীরা লড়াই করছে; ওদিকে

পায়রার জোড়ারা কেমন পরস্পরের মুখচুম্বন করে সুখানুভব করছে। গৃহ-সারসেরা আবার জ্ঞানী-বৃদ্ধের মত মেপে মেপে পা ফেলছে। বাহ্! বসন্তসেনার এই বাড়ী বাস্তবিকই নন্দনবনের শোভা ধারণ করেছে। চল গো! এবার কোথায় যাবে?

'অষ্টম মহলে আসুন মহাশয়!'

মৈত্রেয় অষ্টম মহলে পা দিয়ে একজন দীর্ঘকান্তি,—মহার্ঘ পোষাক পরিহিত সুন্দর যুবককে দেখে নিম্নস্বরে দাসীকে জিজ্ঞেস করল, 'এই যুবকটি কে?'

দাসী বলল, 'উনি আমাদের ঠাকরুণের ভাই।'

'তাই হবে।' মৈত্রেয় দীর্ঘশ্বাস ফেলল, 'তপস্যা না করলে কি বসন্তসেনার ভাই হওয়া যায়!' বলতে বলতেই আরেকজন বৃদ্ধার দিকে দৃষ্টি পড়ল। গুল-বাহার চাদর গায়ে, তেলে চোবানো চক্‌চকে জুতো প'রে উচ্চাসনে বসে আছেন।—'উনি কে গো?'

'উনি আমাদের ঠাকরুণের মা।' দাসী উত্তর দিল।

মৈত্রেয় আর নিজেকে সংযত করতে পারল না। বলে উঠল, "হ্যাঁগা মেয়ে! এত ধন-ঐশ্বর্য তোমাদের—বলি, বাণিজ্যের জাহাজাদি চলে নাকি?'

দাসী তো মৈত্রেয়র কথা শুনে মুখে আঁচল চাপা দিয়েও হাসি—চাপতে পারল না। মাথা নেড়ে বলল, 'না, না!'

মৈত্রেয়ও তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারল। বলল, 'দেখ! আমি আবার একথা জিজ্ঞেস করছি! সত্যিই আমি মূর্খ! সখা ঠিকই বলে। তোমাদের তো নির্মল প্রেমের জলে মদন-সমুদ্রে স্তন-নিতম্ব-জংঘাদিই মনোহর জাহাজ!—তা যা হোক। পূর্বে যা বৃত্তান্ত শুনেছিলাম, এখন সচক্ষে দেখে বুঝলাম—ত্রিলোকের ঐশ্বর্য এই একস্থানে জড়ো হয়েছে। কুবের ভবনও বুঝি এর কাছে তুচ্ছ।—তা তোমাদের ঠাকরুণটি কোথায়?'

'ওই যে, উদ্যানে বসে আছেন! আসুন!'

উদ্যানে প্রবেশ করে আরও মোহিত হয়ে গেল মৈত্রেয়। কি

সুন্দর উদ্যান। কত রকমের গাছ! কত রকমের ফুল ফুটে আছে,—স্বর্ণ যুঁই, শিউলি, মালতী, মল্লিকা, নবমল্লিকা, কুরুবক, মাধবীলতা নন্দনবনের শোভাও এর কাছে ম্লান। ওদিকে, নবভানুর মত সমুজ্জ্বল কমল-রক্তোৎপলে দীঘিটি—পরিপূর্ণ! বাঃ! চমৎকার!

তখনই বসন্তসেনার দৃষ্টি পড়ল এদিকে। তাড়াতাড়ি উঠে এসে করজোড়ে বলল, 'একি! মৈত্রেয় মহাশয় যে! আসতে আজ্ঞা হোক। আসুন! এই আসনে বসুন!'

'ওগো, তুমি বসো!' হেসে বলল মৈত্রেয়। বলতে বলতে অবশ্য বসেও পড়ল।

'বণিক পুত্রের কুশল তো?' বসন্তসেনা লাজুক স্বরে বলল।

'হ্যাঁ গো সবই কুশল। তুমি বসো।'

'মৈত্রেয় মহাশয়! কি জন্যে আসা হয়েছে এখন!' বসন্তসেনা বিনীত স্বরে জানতে চাইল।

মৈত্রেয় কি ভাবে কথাগুলি উত্থাপন করবে ভেবে মনে মনে কথাগুলি গুছিয়ে নিল। তারপর বলল: 'তবে বলি শোনো। চারুদত্ত মহাশয় কৃতাঞ্জলি হয়ে এই কথা নিবেদন করছেন—'

'কি আজ্ঞা করেছেন?' বসন্তসেনাও কৃতাঞ্জলি হয়ে প্রশ্ন করল।

'তিনি বলেছেন,' মৈত্রেয়ও বেশ কৌশলের সঙ্গে বলল, 'তিনি বলেছেন যে 'আমি সেই স্বর্ণ অলঙ্কারগুলি নিজের ভেবে দ্যূত-ক্রীড়ায় হারিয়েছি; সেই আড্ডা ধারীও রাজার কাজে কোথায় যে চলে গেল—তাকে আর খুঁজে পেলাম না—'

বসন্তসেনা সবই বুঝতে পারল। বুঝতে পারল এই জন্যেই, এই মহত্ব গুণের জন্যই চারুদত্তের প্রতি ওর ভালবাসা এত তীব্র—হয়ে উঠেছে। চোরের চুরির দায়ও নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন তিনি।

মৈত্রেয় তখন নিতান্ত অনিচ্ছাভরে সেই রত্নমালাটি বার করে বসন্তসেনার দিকে তুলে ধরে বলল, 'পরিবর্তে এই রত্নমালাটি গ্রহণ কর।'

মনে মনে তখন বসন্তসেনা ভাবছে যে সেই অলঙ্কারগুলি দেখাবে

কিনা। তারপর ভাবল, না থাক, দরকার নেই।

এদিকে বসন্তসেনাকে চুপ করে থাকতে দেখে মৈত্রেয়র মনে আশা জাগল যে রত্নমালাটি সে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। তার তো প্রথম থেকেই ইচ্ছে নয় মালাটি বসন্তসেনাকে দেওয়ার। নেহাত সখা চারুদত্তের সনির্বন্ধ অনুরোধে সে এসেছে। সুযোগ বুঝে সে বলে উঠল, 'তুমি কি তার রত্নমালাটি গ্রহণ করবে না?'

বসন্তসেনা সঙ্গে সঙ্গে মধুর হেসে বলে উঠল, 'সে কি! রত্নমালাটি নেব না কেন? কই দিন!' দুহাতের অঞ্জলী পেতে মালাটি গ্রহণ করেই বুকে চেপে ধরল। শরীর কেঁপে উঠল ওর! মনে হ'ল যেন দয়িতের সুখস্পর্শ পেল! তারপর মুখের কাছে নিয়ে চুম্বন করল মালাটিতে। তারপর কতকটা আপন মনে এবং মৈত্রেয়কে উদ্দেশ্য করেই বলে উঠল, 'সহকার-বৃক্ষ পুষ্পহীন—হলেও তা হ'তে মধুবিন্দু ঝরে।—মহাশয়! আমার নাম করে জুয়ারী চারুদত্তকে বলবেন, আজ সন্ধ্যার সময় আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাব!'

মনে মনে প্রমাদ গনল মৈত্রেয়! এ তো দেখছি সাংঘাতিক মেয়ে! সখাকে আবার বিপদে ফেলবে দেখছি! তবু মনোভাব গোপন করে কাষ্টহাসি হেসে বলল, 'এ তো খুব ভাল কথা! আমি অবশ্যই সখাকে গিয়ে বলব—' কথাগুলো বলেই চট্ করে দাঁড়িয়ে হন্ হন্ করে হাঁটা দিল। খানিক গিয়ে—পথ প্রদর্শিকা দাসীর দেখা পেয়েই ফের মুখ ঘুরিয়ে বসন্তসেনার উদ্দেশ্যে বলল, 'অবশ্যই বলব!' তারপর মুখ ঘুরিয়ে গজ্ গজ্ করে অস্ফুটে বলল, যাতে দাসী না শুনতে পায়, 'বলব যে সখা, এই নারীর সঙ্গ তুমি ছাড়ো!'

  

মৈত্রেয় চলে যেতেই বসন্তসেনার এতক্ষণের রুদ্ধ উচ্ছ্বাস বাঁধ ভাঙা বন্যার মত ঝাঁপিয়ে পড়ল। প্রিয় সন্নিধানে যাবে, এই চিন্তাতেই উতলা হৃদয়ে ডাক দিল, 'মদনিকে! ওলো মদনিকে! আমাকে আবরণ আভরণে সাজিয়ে দে! আর ওই অলঙ্কারগুলি সঙ্গে নে! চারুদত্ত মশায়ের সঙ্গে দেখা করতে যাব আমি!'

মদনিকে এসে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ঠাকরুণ! মেঘে আকাশ ঢেকে ফেলেছে। ভয়ঙ্কর ঝড় জল হবে যে।—'

বসন্তসেনা হেসে, শরীরে নৃত্যের হিল্লোল তুলে বলল: "উদয় হোক মেঘ, আসুক ঘোর রজনী, বর্ষণ হোক অবিরত, তবু, প্রিয় অভিসারে যে হৃদয় ধায়, এ সবই সে তুচ্ছ বলে গণ্য করে।—আয় সখী! আমাকে সাজিয়ে দে।'

  

চারুদত্ত গৃহ প্রাঙ্গনেই উৎকণ্ঠ চিত্তে অপেক্ষা করছিলেন মৈত্রেয়র জন্য আকাশে প্রবল কালো মেঘের আনাগোনা দেখে নিজের মনেই বলে উঠলেন, 'একি! এ যে অকালে দুর্দিনে! শুধু তো অন্তরীক্ষ নয়, আমার অন্তরকেও যেন কালো মেঘে ছেয়ে ফেলছে। না জানি মৈত্রেয় কি বার্তা নিয়ে আসে!'—

ঠিক সেই সময়েই মৈত্রেয়র গলা শোনা গেল। চারুদত্ত এগিয়ে গেলেন। 'এস সখা! কার্য্য সফল হয়েছে তো?'

'মোটেও না,' মৈত্রেয় রাগতঃ স্বরে উত্তর দিল, 'কার্য্যটা সমস্তই নষ্ট হয়ে গেল!'

'সে কি!' চারুদত্ত ভগ্ন স্বরে প্রশ্ন করলেন, 'রত্নমালাটি কি তবে তিনি গ্রহণ করলেন না?'

মৈত্রেয় ব্যঙ্গ মেশানো স্বরে উত্তর দিল, 'হায়! আমাদের কি এমন সৌভাগ্য যে নেবেন না! দেখামাত্রই তিনি তাঁর নব-কমল কোমল অঞ্জলী মাথায় তুলে স্বচ্ছন্দে নিয়ে নিলেন।'

'তবে যে বললে কার্য্যটি নষ্ট হয়ে গেল?'

'তা নষ্ট হল না তো কি? যা কখনো ব্যবহারে আসে নি,—চোরে যা চুরি করে নিয়ে যায়, সেই অল্প মূল্যের স্বর্ণ অলঙ্কারের জন্য সেই চতুঃসাগরের সারবস্তু—সেই রত্নমালাটি তো খোয়াতে হল?'

'না সখা, ও কথা বলো না,' চারুদত্ত ক্লেশের স্বরে বললেন, 'বিশ্বাস করে তিনি আমার কাছে রেখেছিলেন। আমি সেই বিশ্বাসের ধার শুধলাম মাত্র।'

চারুদত্তের মুখের দিকে তাকিয়ে মৈত্রেয় আর রসিকতা করতে সাহস পেল না। গম্ভীর স্বরে বলল, 'তা যাক গে। দেখ সখা।—তিনি তোমাকে বলতে বলেছেন যে আজ সন্ধ্যায় তিনি এখানে আসছেন।'

'বল কি সখা?' চারুদত্ত কিঞ্চিৎ বিস্ময় প্রকাশ না করে পারলেন না, 'এই দরিদ্রের কুটিরে তিনি আসবেন?'

মৈত্রেয় গম্ভীর স্বরে কথা শুরু করেও স্বভাব সুলভ রসিকতা না করে পারল না। বলল, 'আসবেন বলেই তো বললেন।—জান সখা, আমার মনে হয়, রত্নমালাটি পেয়ে সন্তুষ্ট হয় নি। আরও কিছু চায় আর কি। তা বলি কি সখা। এই নারীর সঙ্গ তুমি ছাড়ো। এরা ঠিক জুতোয় ঢোকা কাঁকরের মত। বের করা কষ্টকর। তা ছাড়া,—গণিকা, হস্তী, কায়স্থ, ভিক্ষু, ধূর্ত—এরা যেখানে বাস করে দুষ্ট লোকেরাও সেখানে থাকে না।'

'সখা। তুমি যতই বল, তিনি এই দীনের গৃহে স্বেচ্ছায় আসতে চেয়েছেন, এই তো আমাদের সৌভাগ্য।' চারুদত্ত হেসে বললেন, 'চল, সখা, তাঁকে অভ্যর্থনার উপযুক্ত আয়োজন করিগে।'



চারুদত্ত উদ্যানে বসে জল ভারাক্রান্ত চঞ্চল, ঘনকৃষ্ণ—মেঘরাশির আনাগোনা অত্যন্ত উদ্‌বিগ্ন চিত্তে লক্ষ্য করে যাচ্ছিলেন। সন্ধ্যা নামার পূর্বেই যেন ঘোর অমারাত্রির অন্ধকার চরাচর ছেয়ে ফেলেছে। যখন প্রকৃতই সন্ধ্যা নেমে আসবে, সুরু হবে অঝোর বর্ষণ, তখন তো কীট-পতঙ্গও আপন আপন আশ্রয় ছেড়ে নড়বে না। তখন বসন্তসেনা কি আর আসবে! চারুদত্ত অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগলেন। আর উতলা হৃদয়কে শান্ত করার বৃথা চেষ্টা করতে লাগলেন। গুঁড়ি গুঁড়ি বর্ষণ সুরু হল।

সখার অবস্থা দেখে মৈত্রেয় স্বভাবসুলভ রসিকতা করে বলল, দেখ সখা! কদম্ব ফুলগুলি সুখে প্রস্ফুটিত হয়ে ধারাবর্ষণের অপেক্ষা করছে, ওদিকে আনন্দে শিখী ডাকছে; আর দেখ! নীচকুলোদ্ভবা যুবতীর মত বিদ্যুৎ এই স্থান থেকে মুহূর্তে অন্যস্থানে সরে পড়ছে! আর আঁধার নেমেছে দেখ! যেন সুনিবিড় পয়োধরে আচ্ছন্ন করেছে দিশি। ঠিক কুপিতা সপত্নীর মত প্রেমিকার আগমনের পথ রোধ করে আছে যেন।' লাঠি উঁচিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আবার সে বলল, 'ঘন ঘন গর্জন করে প্রেমিকারে মোর করিস্ নিবারন, ওরে মূঢ় নিশি! তোর কেন হেন আচরণ! প্রেমিকার নিবিড় পয়োধরে লগ্ন হয়ে অবিরল, রবে যদি সখা মোর, তোর তাতে কি আসে যায় বল্?'

মৈত্রেয়র অঙ্গভঙ্গী আর কথা শুনে উদ্‌বিগ্নতার মধ্যেও চারুদত্ত হেসে ফেললেন। তখনই সদর দ্বারে করাঘাতের শব্দ শোনা গেল।

চারুদত্ত দ্রুত পায়ে এগিয়ে গিয়ে দ্বার খুলে দিলেন।

ছত্রধারিণীর সঙ্গে উজ্জ্বল অভিসারিকা বেশে সোৎকণ্ঠা বসন্তসেনা প্রবেশ করল।

মৈত্রেয়ও এগিয়ে এল সখা চারুদত্তের পাশে। বসন্তসেনার দুই পদ্ম-আঁখি লাজে ঈষৎ আনত। চারুদত্ত নির্নিমেষ তাকিয়ে রয়েছেন। এই সময় মৈত্রেয় চারুদত্তের কানের কাছে মুখ নিয়ে নিম্নস্বরে রসিকতা করে উঠল: সখা! দেখ! দেখ! ছত্রের কোন্ বেয়ে বৃষ্টিবিন্দু ঝরে ঝরে পড়ে বসন্তসেনার একটি স্তন যেন বিধিমতে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হয়েছে! আর অপেক্ষা করছ কেন? ঘরে নিয়ে যাও!' তারপর যেন মুগ্ধ দুই প্রেমিক যুগলকে সচকিত করার জন্যই বলে উঠল, 'সখা! তোমরা দাঁড়িয়ে কেন? সখি বসন্তসেনার কাপড় যে ভিজে গিয়েছে! গৃহভ্যন্তরে নিয়ে যাও! শুষ্ক কাপড় পরিয়ে দাও গে!'

মৈত্রেয়র কথায় দুজনেরই যেন সম্বিত ফিরল। চারুদত্ত বলে উঠলেন, 'তাই তো! এস প্রিয়ে! আমার সঙ্গে এসো!' চারুদত্তের পশ্চাতে বসন্তসেনা এগিয়ে গেল।

সঙ্গের দাসী ছত্রধারিণীও এগুতে যাবে, মৈত্রেয় বাধা দিল, 'ওগো! তুমি ওদিকে কোথা যাও। আমার সঙ্গে এসো। আমি তোমার সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।'

দাসী মৈত্রেয়র অনুসরণ করল।

  

প্রভাতে উজ্জয়িনীর নিদ্রাভঙ্গ হয় শানাইয়ের মধুর সুরে, আর পাখীদের মিষ্ট কলগুঞ্জনে। আজও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। তবে বুঝি একজনেরই সুখনিদ্রা আজ ভঙ্গ হয় নি। দিগন্তের আকাশ অরুণবর্ণ ধারণ করেছে। বালার্ক-রশ্মি বাতায়নের মধ্য দিয়ে তির্যক ভাবে আসঙ্গ-তৃপ্ত বসন্তসেনার আলুথালু নিদ্রামগ্ন দেহের উপর এসে পড়েছে।

বসন্তসেনার সখী ফেরার জন্য প্রস্তুত হয়ে সুখে নিদ্রিতা ঠাকরুণের

দিকে কতক্ষণ দেখল। তারপর কাছে এগিয়ে গিয়ে মৃদুকোমল স্বরে ডাকল, 'ঠাকরুণ। প্রভাত হয়েছে উঠুন।'

বসন্তসেনা চোখ মেলল।—'কি? রাত্রি-প্রভাত?'

সখী ঠোঁটের কোনে মৃদু হেসে বলল, 'আমাদের প্রভাত। ঠাকরুণের এখনও রাত্রি।'

বসন্তসেনা মৃদু লাজ রক্তিম হাসি হেসে সুচারু অঙ্গে ঢেউ তুলে আলস্য ভাঙ্গল। তারপর বলল, 'ওলো। তোদের জুয়ারীটি কোথায়?'

সখী বলল, 'ঠাকরুণ। দত্তমশাই বর্ধমানককে গাড়ী প্রস্তুত রাখতে বলে গিয়েছেন। বলেছেন আপনাকে পুষ্পকরণ্ডক উদ্যানে নিয়ে যেতে।'

'তাই?' বসন্তসেনা শয্যা ছেড়ে উঠে সখীকে বুকে জড়িয়ে ধরল। আল্‌তো করে সখীর চিবুকে চুম্বন করে লাজুক স্বরে বলল: "রাত্রে ভাল করে তাঁকে দেখতে পাইনি, আজ তাহলে তাঁকে ভাল করে দেখব। ওলো? আমি কি অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছি?'

'শুধু অন্তঃপুরে নয়,' সখী সহাস্যে বলল, 'সকলের অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করেছেন।'

ঈষৎ সংশয়ের স্বরে তবু বসন্তসেনা বলল, 'আমি আসাতে চারু-দত্তের পরিজনদের কি কষ্ট হয়েছে?'

সখী রহস্য করে বলল, 'তাদের পরে কষ্ট হবে বটে।'

'কেন? পরে কেন?' বসন্তসেনার স্বরে বিস্ময়।

'ঠাকরুণ যখন চলে যাবেন, তখন তাদের কষ্ট হবে বই কি!'

বসন্তসেনা গাঢ় স্বরে বলল, 'তখন তো আমারই বেশী কষ্ট হবে রে।'

সেই সময় রদনিকা, চারুদত্তের দাসী, একটি বালককে নিয়ে প্রবেশ করল। যতই সে বালককে বলে, 'আয়। আমরা এই মাটির গাড়ীটা নিয়ে খেলা করি, ততই বালক চেঁচিয়ে বলতে থাকে,—কক্ষনো না। এই মাটির গাড়ী নিয়ে আমি খেলব না। আমার

সেই সোনার গাড়ীটা নিয়ে এসো।'

বসন্তসেনা এগিয়ে এল। 'রদনিকা। এই বালকটি কে?'

রদনিকা বলল, 'এটি চারুদত্ত মহাশয়ের পুত্র, রোহসেন।'

'তাই! আমি ঠিকই ভেবেছি।' বসন্তসেনা বলল, 'আপন পিতার প্রতিকৃতি যেন।' তারপর দুহাত বাড়িয়ে ডাকল: 'আয় বাছা। আমার কোলে আয়।'

বালক কেমন সন্দেহের চোখে বসন্তসেনার দিকে তাকাল। তারপর বলে উঠল, 'তোমার কোলে কেন যাব? তুমি কে?'

বসন্তসেনা হেসে বলল, 'আমিও যে তোমার বাবার একজন দাসী।'

রদনিকা তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'রোহসেন। ইনি তোমার মা হন্।'

বালক রোহসেন একবার রদনিকার দিকে তারপর মুখ ঘুরিয়ে বসন্তসেনার বাড়ানো হাতের দিকে একপা এগুতেই বসন্তসেনা এগিয়ে এসে সাগ্রহে তাকে কোলে তুলে নিল। চুমায় চুমায় কচি মুখ ভরিয়ে দিল। তারপর সখীর দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'ওলো! সেই স্বর্গ অলঙ্কারগুলি এনে দে! ঐগুলি দিয়ে বাছার সোনার গাড়ী তৈরী হবে।'

সখী আদেশ মত গতরাত্রে যে ঘরে ছিল সেখান থেকে সঙ্গে আনা গহণাগুলো আনতে গেল।

তখনই বাইরে থেকে বর্ধমানক চেঁচিয়ে ডাকল, 'রদনিকে, ও রদনিকে! বসন্তসেনা ঠাকরুণকে বল, শকট প্রস্তুত! উনি খিড়কির দরজায় আস্থন!'

বসন্তসেনাও শুনল। শুনে বলল, 'রদনিকে! ওকে একটু অপেক্ষা করতে বল! আমি একটু তৈরি হয়ে নিই। আর শোন! সখীর কাছ থেকে অলঙ্কারগুলি নিয়ে রেখো। সুবিধেমত বাছাকে সোনার গাড়ি তৈরি করে দিও।' বলে কোল থেকে রোহসনকে নামিয়ে দিল।

রদনিকা চলে গেল রোহসেনকে নিয়ে। বসন্তসেনাও ভেতরে স্নানাগারের দিকে গেল।

খিড়কির দরজার সামনে তখনই বর্ধমানক আধহাত জিভ কেটে নিজে নিজেই বলে উঠল: 'এই যাঃ। শকটের বিছানাটি আনতে যে ভুলে গেছি! আচ্ছা! ঠাকরুণ তৈরী হোন্! আমি এই ফাঁকে শকটে করেই গিয়ে নিয়ে আসি!' শকট নিয়ে চলে গেল বর্ধমানক।

কয়েক মূহূর্ত পরেই রাজার শ্যালক সংস্থানকের শকট নিয়ে চালককে এসে ঠিক চারুদত্তের গৃহের সামনেই থেমে যেতে হ'ল। পথ রুদ্ধ! সামনে একটি শকটের চাকা কাদায় বসে গিয়েছে। গত রাত্রের বৃষ্টিতে কর্দমাক্ত। শকটিও বেশ বড় এবং অনেক ভারি দ্রব্যে বোঝাই হওয়ায় সেই শকটের চালক ও তার একজন সহকারী চাকাটি নাড়াতেও পারছে না। তাই দেখে সংস্থানকের শকট চালক, শকট রেখে এগিয়ে গেল সাহায্য করতে।

একটু পরেই বসন্তসেনা সখীর সঙ্গে খিড়কির দরজায় এসে সেই শকটেই উঠে বসল। তারপর মুখ ঘুরিয়ে সখীকে বলল, 'তুই এখন যা! বিশ্রাম কর!'

'যে আজ্ঞে, ঠাকরুণ!' বলে সখী চলে গেল।

বসন্তসেনা শকটের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে গুছিয়ে বসতেই ওর দক্ষিণ চক্ষুতে স্পন্দন হল! কি এক অমঙ্গল আশঙ্কায় হঠাৎই ওর বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল! পরক্ষণেই অবশ্য নিজের মনে হেসে উঠে ও ভাবল যে চারুদত্তের দর্শনেই সব অশুভ দূর হয়ে যাবে!

ওদিকে আগের শকটটির চাকা কর্দমমুক্ত করে তাকে রওনা করিয়ে দিয়ে সংস্থানকের শকট চালক ফিরে এসে শকটের সামনে চালকের আসনে বসে বলদদুটোর পিঠে চাবুক কষাতেই হু-হু করে শকট ছুটল।

পরক্ষণেই ঢাঁড্ড়ার শব্দ আর রাজকীয় ঘোষকের কণ্ঠস্বর চলন্ত গাড়ীর ভেতরে বসেই শুনতে পেল বসন্তসেনা।—

"শোনো! শোনো! শোনো! প্রহরীরা সব আপন আপন ক্ষেত্রে সতর্ক হয়ে থাকো! আজ গোপাল পুত্র আর্যক কারাগার ভেঙ্গে, কারাগারের প্রধানকে বধ করে, শিকল ছিঁড়ে পালিয়েছে। তাকে খুঁজে বার করে বন্দী করতে হবে। তোমরা সব তৎপর হও।"



শর্বিলক এবং তার গুপ্তদলের সাহায্যে, কারাগারের প্রহরী কয়েকজনও প্রত্যক্ষ সাহায্য করায়, গোপালপুত্র আর্যক কারাগার থেকে পালাতে সক্ষম হলেন। কিন্তু রাজা পালকের চর-অনুচরেরা ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। বিশেষ করে প্রধান কারাগারাধ্যক্ষ আর্যকের হাতে নিহত—হওয়ায়, রাজরক্ষী, এবং নগররক্ষীর দল একেবারে ক্ষেপে গেছে। আর্যককে পেলে তারা ছিঁড়ে খাবে।

আর্যক বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। দলের গোপন গৃহে যে করে হোক পৌঁছতেই হবে। নগরীর বাইরে সেই গৃহ। অথচ আর্যকের প্রধান অসুবিধা একপায়ে এখনও শিকলের খানিকটা অংশ রয়ে গেছে। কোন কর্মকারের সাহায্য নিতেই হবে। নচেৎ এই শিকল থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না। অথচ, কর্মকারদের বাস মূলতঃ শহরের একপ্রান্তে। সেখানে যাওয়া কতটা নিরাপদ হবে তিনি বুঝতে পারলেন না। তবু সাহস সঞ্চয় করে শহরে ঢুকে পড়লেন। একটি বড় জীর্ণ বাড়ির খিড়কির দরজা খোলা দেখে ভাবলেন আপততঃ এখানেই আশ্রয় নেওয়া যাক।

তিনি সবে দরজার আড়লে গেছেন সেই সময় হৈ হৈ করে একটা শকট এসে সেই খিড়কির দরজার সামনে দাঁড়াল। শকট চালক বাইরে থেকেই হাঁক পাড়ল : রদনিকে। বসন্তসেনা ঠাকরুণকে বল। এবার তিনি চলুন, পুষ্পকরণ্ডক উদ্যানে।

আর্যক দরজার আড়ালে থেকে তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারলেন যে

এটি নগরনটীর শকট, এবং নগরীর বাইরেই যাচ্ছে। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতেই হবে। নচেৎ, নিশ্চিত বিপদের মুখে পড়তে হবে। —একথা মনে হতেই আর্যক সাবধানে দরজায় আড়াল থেকে উঁকি দিলেন। দেখলেন শকট চালক বলদদুটোকে ঘাস খাওয়াতে ব্যস্ত। সুযোগ বুঝে তিনি কোমর নুইয়ে একপায়ের ছেঁড়া শিকলটাকে চেপে ধরে, যাতে কোনরকম শব্দ না হয়, ধীরে ধীরে শকটের পেছন দিকে এগিয়ে গেলেন। হঠাৎ তার শিকলচাপা হাতটা ফস্‌কে গিয়ে ঝন্ ঝন শব্দ হল।

শব্দ শুনে শকটচালক বর্ধমানক ভাবল বুঝি ঠাকরুণের পায়ের নূপুরের শব্দ। সে সামনে থেকেই বলে উঠল, 'ঠাকরুণ! পেছন দিক দিয়েই উঠে পড়ুন!'

আর্যক তাড়াতাড়ি উঠে শকটের দরজা বন্ধ করে দিলেন।

গাড়ীটা দুলে উঠতেই বর্ধমানক বুঝল যে ঠাকরুণ উঠে বসেছেন। সেও চালকের আসনে বসেই হেট্ হেট্ করে বলদ দুটোর লেজে মোচড় দিতেই সে দুটো উর্ধশ্বাসে ছুটল!

  

নগররক্ষীদের সদরে আজ মহা কোলাহল। রাজার আদেশে আর্যককে ধরে আনার জন্য নগররক্ষীদের মধ্যে সাজ সাজ রব পড়ে গেছে। তাদেরই একজন সহকারী নগররক্ষক বীরক চেঁচিয়ে অধস্তনদের নির্দেশ দিল। কাউকে বহির্দ্বারে। কাউকে উত্তরে, পশ্চিমে বা পূবের দিকে—পাঠাল। তারপর নিজে প্রাচীরের ওপর উঠে আরেক সহকারী চন্দনককে চেঁচিয়ে ডেকে এদিকে আসতে বলল।

চন্দনকও ব্যস্ত সমস্ত হয়ে চেঁচিয়ে বীরককে এবং অন্যান্যদের ডেকে নির্দেশ দিল। নগররক্ষীদের এই সদরের পাশদিয়েই নগরীর বাইরে যাবার পথ।

ঠিক সেই সময় বর্ধমানক মনের আনন্দে গান গাইতে গাইতে শকট চালিয়ে কথামত পুষ্পকরণ্ডক উদ্যানের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল।

সেই সময় বীরকের দৃষ্টি পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে সে হাত তুলে

চেঁচিয়ে বলে উঠল : 'এই গাড়োয়ান! গাড়ী থামা! এ গাড়ী কার? আরোহী কে? যাচ্চেই বা কোথায়?' রাজাদেশে কোন শকটকেই বিধিমত তল্লাসী না করে নগরের বাইরে যেতে দেওয়া হচ্ছে না, সে জন্যেই গাড়ী থামাল সে।

বর্ধমানক তো জানে যে সে চারুদত্তের শকট নিয়ে যাচ্ছে এবং আরোহীনী স্বয়ং বসন্তসেনা। তাই সে নির্ভয়ে উত্তর দিল, 'আরে, এটি চারুদত্তের গাড়ী, এতে বসন্তসেনা আছেন। এঁকে পুষ্পকরণ্ডক উদ্যানে নিয়ে যাচ্ছি প্রভুর আদেশ মত।'

'দাঁড়া!' বীরক প্রাচীরের ওপর থেকেই নীচে দাঁড়ানো চন্দনককে বলল, 'গাড়ীর ভেতরটা একবার দেখা যাক!'

চন্দনক নিস্পৃহভাবে বলল, 'দরকার নেই, চলে যাক।'

'চলে যাবে?' বীরক অবাক বিস্ময়ে প্রশ্ন করল, 'না দেখেই যেতে দেওয়া হবে?'

'হ্যাঁ, তাই হবে।' চন্দনক দৃঢ় স্বরে উত্তর দিল।

'কেন? কার বিশ্বাসে?' বীরক অত সহজে ছেড়ে দিতে চাইল না।

চন্দনকও প্রত্যয়ের স্বরে বলল, 'চারুদত্ত মশায়ের বিশ্বাসে।'

'কে চারুদত্ত? বসন্তসেনাই বা কে? তদন্ত না করেই বা যেতে দেওয়া হবে কেন?' বীরকও দমবার পাত্র নয়।

চন্দনকও হেসে ব্যঙ্গ ভরে বলল, 'আচ্ছা! চারুদত্ত মশাই কে তা তুই জানিস না? বসন্তসেনাকেও জানিস্ না? তবে তো তুই আকাশের চাঁদকেও জানিস্ না, জোছনাকেও জানিস্ না!'

বীরক অতশত বোঝেনা। রাজাজ্ঞা যথাযথ পালনই তার কাছে সব চেয়ে বড় কথা। তাই সে বলে উঠল, 'ওরে চন্দনক! জানি আমি চারুদত্তে, জানি আমি বসন্তসেনায়; রাজাজ্ঞা-পালন-কালে না জানি গো আপন পিতায়।'

চন্দনক বুঝতে পারল যে বীরককে অত সহজে নিরস্ত করা যাবে না। অথচ, সামান্য কারণে বসন্তসেনা ঠাকরুণকে বিরক্ত করতেও

তার ভাল লাগছিল না। তবু, কর্তব্য বড় বালাই। তাই সে বীরককে বলল, 'ঠিক আছে। আমিই যাচ্চি। আমি দেখলেই তোরও দেখা হবে।'

বীরক টিপ্পনী কেটে বলল, 'হ্যাঁ, তুই দেখলেই রাজারও দেখা হবে।'

চন্দনক কোন উত্তর না দিয়ে গাড়ীর দিকে এগিয়ে গেল। একটু দূরে, পথের মাঝখানে শকট থামিয়ে অপেক্ষা করছিল বর্ধমানক। চন্দনক শকটের কাছে গিয়ে দরজাটা হাত দিয়ে খুলে ভেতরে উঁকি দিল।

আর্যক এতক্ষণ ধরে দুই নগররক্ষীর সমস্ত কথাই শুনছিলেন। তাঁর কেবলই ভয় হচ্ছিল যে বীরকের হাতে পড়লে আর রক্ষা নেই। আবার তাঁকে কারাগারে ফিরে যেতে হবে। তারপর হয়তো প্রাণ-দণ্ডই হয়ে যাবে। তবে চন্দনককে তাঁর তত ভয় ছিল না। সে শর্বিলকের বন্ধুলোক, তা তিনি জানতেন। তাই চন্দনক শকটের দরজা খুলে ভেতরে উঁকি দিতেই তিনি চাপা স্বরে বলে উঠলেন, 'নগররক্ষী! আমি আপনার শরণাপন্ন হলাম!'

চন্দনকও স্বভাববশতঃ 'শরণাগতকে অভয় দিলাম' বলেই—দেখতে পেল!—'একি! গোপাল পুত্র আর্যক যে! সর্বনাশ! বাজের ভয়ে পালিয়ে এসে পাখী যে ব্যাধের হাতে ধরা পড়ল!' আবার ভাল করে দেখল চন্দনক। শর্বিলকের বন্ধু এই আর্যক, সেটা বড় কথা নয়। একদিন এই হতভাগ্য দেশকে অত্যাচারী, শোষক রাজা পালকের হাত থেকে মুক্ত করতে এই আর্যকই সমর্থ হবে তাতে সন্দেহ নেই। সুতরাং এঁকে বাঁচাতেই হবে। সে আর্যককে মৃদুস্বরে বলল, 'চুপ করে বসে থাকুন! ভয় নেই। যা করার আমি করছি।' বলেই বাড়ী থেকে নেমে বীরকের দিকে এগিয়ে গেল। বীরক তখন সদর দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছে।

চন্দনক হেসে তাকে বলল, 'দেখলাম আর্য—ইয়ে মানে আর্যা বসন্তসেনা গাড়ীতে বসে আছেন। তিনি বললেন, 'আমি রমণী,

চারুদত্তের কাছে যাচ্ছি! রাজপথে অবলার অপমান করা কি উচিত?'

বীরক চন্দনকের দিকে এগিয়ে আসতে আসতে বলল, 'চন্দনক! তোর কথায় আমার সন্দেহ হচ্চে!'

'কি-কি কিসের সন্দেহ?' চন্দনক বিষম খেয়ে গেল।

'না। প্রথমে বললি আর্য, পরক্ষণেই কথাটা বদলে বললি— 'আর্যা'। সে জন্যেই সন্দেহ হচ্চে।'

'আরে বাবা! আমরা দাক্ষিণাত্যের লোক। কোন সময় 'দৃষ্টা' কে 'দৃষ্ট' বলে ফেলি, আবার 'আর্যা' কে 'আর্যও' বলে ফেলি।' স্তোক দিতে চাইল চন্দনকে।

'না, না!' বীরক মানল না। আমি একবার দেখে আসি। রাজার বিশ্বাসী লোক হ'য়ে তাঁর আদেশ তো অমান্য করতে পারিনা।'

চন্দনকের মন শঙ্কায় ভরে উঠল। বীরককে যে করে হোক ঠেকাতে হবে। আর্যকের সন্ধান পেলে সব মাটি হয়ে যাবে। পায়ে পড়ে ঝগড়া করা ছাড়া আর উপায় নেই এখন। মনে হতেই রাগের স্বরে সে বীরকে বলে উঠল: 'তুই বিশ্বাসী আর আমি কি অবিশ্বাসী নাকি রাজার? অঁ্যা! আমি দেখে এলাম, তাতে তোর মন উঠল না? তুই কে রে? আচ্ছা, তোর জাতটা কি তুই জানিস্।'

বীরকও সপাটে উত্তর দিল, 'খুব জানি! তা তোর জাতটা কি শুনি?'

'ওরে বীরক! চন্দনকের জাত চন্দ্রের মত বিশুদ্ধ, বুঝলি?'

'ওহো রে!' বীরক ভেংচে উঠল, 'মা-তো তোর ভেরী, বাপ জয়-ঢাক! আর ভাই তোর কারাযন্ত্র, আর তুই সেনাপতি আজ। শুনে হই অবাক।'

'কি তুই আমাকে চামার বললি।' চন্দনক রাগে গর্জে উঠল।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই বললাম।' বলেই বীরক শকটের দিকে এগুতে যাবে কি চন্দনক পা বাড়িয়ে ল্যাঙ্ মেরে ফেলে দিল বীরককে।

বীরক চেঁচিয়ে বলল, 'আমি রাজাদেশ পালন করছি আর তুই আমাকে অপমান করলি? ঠিক আছে। আমি এখনই বিচারালয়ে তোর বিরুদ্ধে নালিশ করছি গিয়ে।' বলে যেই উঠে দাঁড়িয়েছে বীরক, অমনি চন্দনক ক্যাঁৎ করে এক লাথি কষালো তার পশ্চাদ্দেশে। বলে উঠল, 'তুই রাজদ্বারেই যা কি বিচারালয়েই যা, তোর মত কুকুরে আমার কিছুই করতে পারবে না।'

বীরক জানে যে চন্দনকের সঙ্গে শক্তিতে সে পারবে না। তাই যে চেঁচাতে চেঁচাতে রাজবাড়ীর দিকে ছুটে যেতে যেতে বলতে লাগল, 'আয়। আয় তুই। দেখি তোর কত আস্পর্ধা। আয়।'

পলায়নপর বীরকের দিকে তাকিয়ে মুখ ভেংচে উঠল—চন্দনক। তারপরেই পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে গম্ভীর হয়ে বর্ধমানককে কাছে আসতে ইশারা করল। বর্ধমানক এগিয়ে আসতে তার হাতে নিজের কোমরবন্ধনী থেকে দীর্ঘ ছুরিকাটা খুলে নিয়ে তার হাতে দিল। তারপর বলল, 'শোন্। এই অস্ত্রটা বসন্তসেনা ঠাকরুণকে দিয়ে বলবি, চন্দনক তাঁর অনুগত। তিনি যেন তা স্মরণে রাখেন। আর পথে যদি নগররক্ষীরা গাড়ী থামায় তো বলবি যে চন্দনক আর বীরক গাড়ী পরীক্ষা করে ছেড়ে দিয়েছে। বুঝলি? যা। তাড়াতাড়ি চলে যা।'

বর্ধমানক দৌড়ে শকটের কাছে গিয়ে দরজার ফাঁক দিয়ে ছুরিকাটা গলিয়ে দিয়ে বলল, 'ঠাকরুণ। এটা রাখুন।' চন্দনকের কথাগুলোও বলল। তারপর ঘুরে এসে শকটে চেপেই দ্রুত শকট-হাঁকিয়ে চলে গেল।

শকট দৃষ্টির আড়ালে চলে যেতেই চন্দনক বাস্তব অবস্থায় ফিরে এল। এতক্ষণে বীরক নালিশ জানাচ্ছে। এখন ধরা পড়লে চরম শাস্তি অনিবার্য। তার চেয়ে শর্বিলকের সঙ্গে যোগ দেওয়াই শ্রেয়। ভাবামাত্রই সে অঙ্গ থেকে রক্ষীর পোশাক খুলে ফেলে একদিকে ছুঁড়ে দিয়ে বিপ্লবীদের গোপন গৃহের দিকে ছুটল। সে জানে সেই গৃহের সন্ধান।



পুষ্পকরণ্ডক উদ্যানের মাঝে অস্থির পদচারণায় রত চারুদত্ত। মৈত্রেয় বেশ বুঝতে পারছিল কেন এই অস্থিরতা সখার। তাই সে নানান রসের কথা বলে সখার অস্থিরতা নিবারণের প্রয়াস পাচ্ছিল। একসময় বলল, 'সখা। দেখ। এই প্রাচীন শিলাতলাটি ভগ্ন অবস্থায় কতকাল পড়ে আছে। তবু কেমন সুন্দর। এসো, এইখানে বসা যাক।'

চারুদত্ত উপবেশন করতে করতেই প্রশ্ন করল, 'বর্ধমানক আসতে এত দেরী করছে কেন?'

'আমি বলে দিয়েছি বসন্তসেনাকে নিয়ে শীঘ্র যেন এখানে আসে। এখনই এসে পড়বে। স্থির হয়ে বসো না একটু।' মৈত্রেয় আশ্বস্ত- করল তাঁকে।

ঠিক তখনই গুপ্ত আরোহী আর্যককে নিয়ে বর্ধমানক এসে উদ্যানের প্রবেশ পথের সামনে শকট থামাল।

শকট থামতেই আর্যক উঁকি মেরে বাইরে দেখলেন। বুঝলেন, নগর ছাড়িয়ে অনেক দূরে এসে পড়েছেন। ভাবলেন—এই বাগানেই কেন আপাততঃ লুকিয়ে থাকি না। রাতের আঁধারে শর্বিলকের সঙ্গে যোগাযোগ করা যাবে। তারপর ভাবলেন, তাতে কোন লাভ নেই। শোনা যায়, মহাত্মা চারুদত্ত বিপন্ন-বৎসল। একবার তাঁকে দেখে যাই।'

ওদিকে মৈত্রেয় শকটের শব্দ ঠিক শুনতে পেয়েছে। সে বসে বসেই হাঁক পাড়ল: 'বর্ধমানক। এত দেরী হল যে?'

বর্ধমানকও হেঁকে উত্তর দিল, 'রাগ করবেন না মৈত্রেয় মশায়। শকটের বিছানা আনতে ভুলে গেছলাম, তাই যাওয়া আসা করতে দেরী হ'ল তার ওপর আবার পথে রক্ষীরা শকট আটকে ছিল তাই।'

চারুদত্তের ধৈর্য্য বাঁধ মানছিল না। তিনি মৈত্রেয়র হাত ধরে তুলে অনুরোধ করলেন: 'খাও সখা। বসন্তসেনাকে এখানে নিয়ে এসো।'

মৈত্রেয়ও হাসতে হাসতে উঠে বলল, 'শেকল দিয়ে পা বাঁধা আছে নাকি যে আমাকে নামিয়ে আনতে হবে। যাচ্ছি, যাচ্ছি।'

মৈত্রেয় শকটের দরজা খুলে এক পলক দেখেই উর্ধশ্বাসে ফিরে ছুটদিল। একেবারে চারুদত্তের কাছে এসে বলল, 'সখা! এ তো বসন্তসেনা না, এ যে বসন্তসেন!'

'কি পরিহাস করছ সখা!' চারুদত্ত বলে উঠে দাঁড়াতেই মৈত্রেয়র পশ্চাতে দৃষ্টি পড়ল। এক হাতে পায়ের শৃঙ্খল চেপে ধরে আর্যক এদিক ওদিক সতর্ক দৃষ্টি ফেলে এগিয়ে আসছেন। চারুদত্ত বিস্ময়ের স্বরে প্রশ্ন করলেন, 'কে? আপনি? আজানু-লম্বিত বাহু, সমুন্নত স্থুল স্কন্ধ সিংহের মতন, সুবিশাল বক্ষোদেশ, রক্তিম চঞ্চল আয়ত দুই চক্ষু, সর্বাঙ্গে মহাত্মা-লক্ষণ, এক পদে কেন তবে শৃঙ্খল বন্ধন?—আপনি কে?'

আর্যক মুখ তুলে তাকালেন। শ্মশ্রু গুম্ফবিহীন, সমুন্নত শির,—অতিশয় রূপবান, গৌরবর্ণ চারুদত্তের দিকে তাকিয়ে আর্যক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। এমন ব্যক্তিত্বের সামনে বিন্দুমাত্র ভয় বা আশঙ্কা জাগে না।

তিনি এগিয়ে এসে বললেন, 'গোপ-কুলে জন্ম, আমার নাম আর্যক। আমি আপনার শরণাগত হলাম।'

চারুদত্ত বিস্ময়ের স্বরে বসে উঠলেন, 'রাজা পালক ঘোষ পল্লী থেকে যাকে ধরে এনে কারারুদ্ধ করেছিলেন, আপনি কি সেই গোপাল পুত্র আর্যক?

বিনীত স্বরে উত্তর দিলেন আর্যক: 'আজ্ঞে হ্যাঁ!'

চারুদত্ত সহর্ষে বলে উঠলেন, 'বন্ধু! আপনি নির্ভয় হোন!' তারপর বর্ধমানকের দিকে তাকিয়ে বললেন: 'বর্ধমানক। এর পায়ের শৃঙ্খল খুলে দাও।'

বর্ধমানক তৎক্ষণাৎ শকট থেকে যন্ত্রপাতি এনে শৃঙ্খল খুলতে তৎপর হল।

এই ফাঁকে মৈত্রেয় সখা চারুদত্তকে একান্তে ডেকে নিয়ে চাপা স্বরে আশঙ্কা প্রকাশ করল: 'ইনি তো এখনই শৃঙ্খল মুক্ত হবেন। সেই সঙ্গে যে তুমিও যাবে! রাজা জানতে পারলে আর রক্ষা থাকবে না। চল!—আমরাও আমাদের পথ দেখি।'

'আঃ! কি বক্‌ছ! চুপ কর!' চারুদত্ত মৃদু ধমক দিলেন।

আর্যক শৃঙ্খল মুক্ত হয়ে এগিয়ে এলেন। 'লৌহ শৃঙ্খল থেকে মুক্তি দিলেন। কিন্তু স্নেহের অন্য দৃঢ়তর শৃঙ্খলে বাঁধা পড়লাম।—চারুদত্ত! আপনাকে বন্ধু মনে করেই আপনার শকটে চড়েছি। আমাকে ক্ষমা করবেন।'

'ওকথা বলবেন না,' চারুদত্ত বললেন, 'আপনি যে আমাকে বন্ধু বলে মনে করেছিলেন—এতেই আমি কৃতার্থ বোধ করছি।'

আর্যক বললেন, 'এবার অনুমতি দিন! আমি যাই!'

'অবশ্যই,' চারুদত্ত বললেন, 'এ স্থান আপনার পক্ষে নিরাপদ নয়। আপনি আমার শকটেই যান। এইমাত্র শৃঙ্খল খোলা হ'ল। চলতে অসুবিধা হবে আপনার। তাছাড়া, এই নগরীতে বিশ্বের তাবৎ দেশের নানা প্রকার লোক সর্বদাই যাতায়াত করে। তারা আপনার চলবার ধরণ থেকে সন্দেহ করতে পারে। আর রাজার চরেরা তো আছেই! সেদিক থেকে আমার শকট নিরাপদ।'

'আপনি যথার্থই বলেছেন। তবে আমি যাই?' চারুদত্ত এবং আর্যক—আলিঙ্গনাবদ্ধ হলেন। তারপর ধীর পায়ে আর্যক শকটের উদ্দেশে এগিয়ে গেলেন।

চারুদত্ত বললেন, 'বর্ধমানককে বললেই আপনাকে যথাস্থানে নামিয়ে দেবে। পথ মাঝে দেবতারা আপনার রক্ষক হোন।'

আর্যক ঘুরে দাঁড়িয়ে করজোড়ে প্রণাম করে বললেন, 'আপনিই আজ আমার রক্ষক!' পরক্ষণেই দ্রুতপদে উদ্যানের বাহিরে অপেক্ষমান শকটের দিকে চলে গেলেন।

চারুদত্ত একটা উদ্‌গত নিঃশ্বাস চেপে মৈত্রেয়কে বললেন, 'রাজার অপ্রিয় কাজ করে এই স্থানে ক্ষণমাত্র থাকা অনুচিত।—কিন্তু মৈত্রেয়! বসন্তসেনা কেন এলো না? কোথায় গেল? আমার বামচক্ষু স্ফুরিত হচ্ছে, অকারণ ক্রমে কেন ব্যথিত হচ্ছে প্রাণ-মন? যাক। এসো দেখি। ওই শৃঙ্খলটা পরে আছে। ফেলে দাও পুরাতন কুপে। রাজচক্ষু চারিদিকে আছে চর-রূপে। ওই দেখ। একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী আসছে। শীঘ্র এস। অন্য পথ দিয়ে চলে যাই।'



বৌদ্ধ ভিক্ষু উদ্যানের মাঝে পুষ্করিণীতে স্নান সেরে ভিজে বস্ত্র কাঁধে ফেলে বুদ্ধের নাম গান করতে করতে বাহিরের দিকে যাচ্ছিল। এমন সময় পেছন দিক থেকে কে হুঙ্কার দিয়ে থামতে বলল। 'দাঁড়া রে দুষ্ট শ্রমনক, দাঁড়া।'

চম্‌কে উঠে পেছন ফিরে তাকিয়েই দাঁড়িয়ে পড়ল ভিক্ষু। সর্বনাশ। এ যে স্বয়ং রাজার শ্যালক সংস্থানক। ভয়ে বুক শুকিয়ে গেল ভিক্ষুর। এখন কোথায় আশ্রয় নি ?—পরক্ষণেই ভাবল—আমি বুদ্ধের সেবক। আমার কি ভয়। বুদ্ধই আমার একমাত্র আশ্রয়। ভেবেই সে অকুতোভয়ে এগিয়ে গেল।—'এসো উপাসক, এস। রুষ্ট হয়ো না।'

সংস্থানক একেবারে হাইমাই করে চেঁচিয়ে উঠে সঙ্গী বিট্‌-কে বলল, 'দেখ, দেখ, পণ্ডিত। এই ভিক্ষুকটা আমাকে গাল দিচ্ছে ?'

'তাই নাকি ?' পণ্ডিত বললে, 'কি বলছে ?'

'আমাকে উপাসক বলছে। আমি কি নাপিত ?'

সংস্থাপনের কথা শুনে পণ্ডিত হেসে ফেলল।—'আরে, ও তো—তোমাকে বুদ্ধের উপাসক বলছে। এ তো প্রশংসারই কথা।'

ভিক্ষুক আবার বলল, 'ধন্য তুমি, পুণ্যবান তুমি।'

তাই শুনে তো আরও ক্ষেপে গেল সংস্থাপক।—'শোনো, শোনো পণ্ডিত। এই ব্যাটা আমাকে ধন্যপুন্য বলছে।—আমি কি শ্রাবক—না কোষ্টক, না কুম্ভকার।'

'আহা। ওতো তোমাকে ধন্য পুন্য বলে প্রশংসাই করছে।'

পণ্ডিত সংস্থানককে বুঝিয়ে ভিক্ষুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'যাও তো বাছা, তুমি এখন এখান থেকে চলে যাও।'

সংস্থানক ধমকে উঠল, 'না, না। ও এখন যাবে না। দাঁড়িয়ে থাকুক। ততক্ষণ আমি একটু পরামর্শ করে নিই।'

'পরামর্শ? কার সঙ্গে? পণ্ডিত অবাক হয়ে প্রশ্ন করল।

'আমার হৃদয়ের সঙ্গে।'

পণ্ডিত টিপ্পনী দিয়ে বলল, 'ও পদার্থটা তোমার আছে নাকি?'

রাজশ্যালক অবশ্য তা গ্রাহ্য করল না। একপাশে সরে গিয়ে নিজে নিজেকেই বলতে লাগল: 'বাপু, বাছা, যাদু হৃদয়! বল্ দিকি এই ভিক্ষুকটা যাবে কি থাকবে?—কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে একগাল হাসি নিয়ে পণ্ডিতের কাছে এসে বলল, 'পণ্ডিত! আমার হৃদয় বল্‌ছে—।'

—'কি বলছে?'

'বলছে—এই ভিক্ষুকটা যাবেও না, থাকবেও না; নিশ্বাস টানবেও না, ছাড়বেও না, এইখানেই ঝট্ করে পড়ে মরবে।'

শুনেই তো ভিক্ষু পণ্ডিতের সামনে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল. 'বুদ্ধায় নমঃ। আমি শরণাগত, আমাকে রক্ষা কর!'

পণ্ডিত বলল, 'শকার! একে যেতে দাও!'

'দিতে পারি, যদি একটা কাজ করতে পারে।'

'কি কাজ?'—

শকার বললে, 'এমন করে পুকুরের পাঁক তুলে ফেলুক, যাতে পাঁকও তোলা হবে অথচ জল ঘোলা হবে না। কিম্বা জল আগে কোথাও পৃথক করে রেখে, তারপর পাঁক উঠিয়ে ফেলুক!'

পণ্ডিত হতাশ হয়ে আক্ষেপ করে উঠল, 'ওঃ! কি মুর্খতা! মানুষ তো নয়, মাংসপিণ্ড দিয়ে তৈরী এইসব নরদেহধারী রাশীকৃত গণ্ড-মুর্খে ভারাক্রান্ত এই পৃথিবী!' পণ্ডিত এবার শক্ত ধমক দিল শকারকে। 'তুমি থাম তো!' তারপর ভিক্ষুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি যাও তো বাছা! যাও!'

ভিক্ষু মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে চলে গেল।

পণ্ডিত শকারের হাত ধরে বলল, 'এসো। এই শিলাতলে বসো। দেখ, এই উদ্যানের কি মনোরম শোভা।'

শকার একগাল হেসে বসতে বসতে বলল, 'তা যা বলেছ। এই উদ্যানের সত্যিই তুলনা নেই। কিন্তু পণ্ডিত। সেই বসন্তসেনা যে এখনও আমার মনে জাগছে।'

পণ্ডিত বিস্ময়ের স্বরে বললে, 'বল কি। অমন করে যে প্রত্যাখ্যান করলে, তার কথা তোমার মনে জাগছে।'

'হ্যাঁ', শকার বললে, 'দাস স্থাবরককে তাড়াতাড়ি শকট নিয়ে আসতে বললাম, এখনও এল না। আমার ক্ষিদে পেয়েছে। এই মধ্যাহ্নে এতটা হেঁটে যাই কি করে?'

তখনই 'হেই, হেই, থাম্, থাম্' কথাগুলো শোনা গেল। পণ্ডিত খেয়াল করে নি। কিন্তু শকার ঠিক শুনেছে। এক গাল হেসে সে বলল, 'পণ্ডিত। সে এসেছে।'

'এসেছে? কি করে বুঝলে?'

শকার উত্তর না দিয়ে হাঁক পাড়ল: 'বাপু, বাছা দাস স্থাবরক। এসেছিস কি?'

উত্তর এল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'বেশ।' শকার খুশী হয়ে বলল, 'গাড়ীটা ভেতরে নিয়ে আয়।'

'কোন্ পথ দিয়ে আনব, প্রভু?' দাস জিজ্ঞেস করল।

'ওই ভাঙ্গা প্রাচীরটার ওপর দিয়ে নিয়ে আয়।' শকার বলল।

দাস ভয়ে ভয়ে বলল, 'প্রভু, তাহলে বলদ দুটো মরবে, গাড়ীটাও ভাঙ্গবে, আমিও মারা পড়ব, প্রভু।'

'দেখ্, বাছা স্থাবরক,' শকার নির্বিকার স্বরে বললে, 'আমি রাজার শালা। বলদ ম'লে অন্য বলদ কিন্‌ব, গাড়ী ভাঙ্গলে আবার গাড়ী করিয়ে নেব, আর তুই ম'লে আবার অন্য দাস মিলে যাবে।'

স্থাবরক একেবারে হাঁউমাঁউ করে উঠল, 'সবই হবে প্রভু—কিন্তু অধীনের প্রাণটা গেলে আর তো ফিরে পাব না প্রভু।'

'যা বল্‌ছি তাই কর।' শকার বিশ্রী ভাবে চেঁচিয়ে উঠল।

'আহা, হা, তা কি করে হবে', পণ্ডিত বলল, 'চল। বাইরে গিয়ে গাড়ীতে উঠি।'

শকার খানিকটা চুপ করে থেকে বলল, 'বেশ! তুমি আমার গুরু, পরম গুরু, আদরনীয় মাননীয়—তুমিই যাও। আগে ওঠো।'

'ভাল কথা।' বলে পণ্ডিত দুপা এগিয়েছে কিনা এগিয়েছে, অমনি হাঁ-হাঁ করে উঠল শকার: 'গাড়ী কি তোমার বাপের যে তুমি আগে উঠবে? গাড়ী আমার, আমিই আগে উঠব।'

'তুমিই তো আমাকে আগে উঠতে বললে।' পণ্ডিত বলল।

'বলেছিলুম, বেশ করেছিলুম, তবু তোমার তো ভদ্রতা করে বলা উচিত ছিলো—'তোমার গাড়ী, আগে তুমিই ওঠো।'

'আস্ত মর্কট একটা।' পণ্ডিত মনে মনে কথাগুলো বলে প্রকাশ্যে বলল, 'বেশ কথা। যাও। তুমিই আগে ওঠো।'

'তাই তো যাচ্ছি।' শকার উঠে দাঁড়িয়ে চলতে চলতে বলল, 'যা বাছা স্থাবরক। গাড়ী ফেরা।'

স্থাবরক গাড়ী ফেরাতে পশ্চাদ্‌দিকের দরজা ঠেলে গাড়ীর ভেতরে ঢুকতে গিয়েই শকার দেখল ভেতরে কে একজন বসে আছে। ভয়ে শকারের অতবড় দেহটা থর্‌থর্ করে কেঁপে উঠল। চিৎকার করে গাড়ী ছেড়ে দৌড় দিল পণ্ডিতের দিকে। একেবারে পণ্ডিতের গলা দুহাতে জড়িয়ে ধরে মরণ চেঁচান চেঁচিয়ে উঠল: 'ও বাবা গো। পণ্ডিত; এইবার আমরা মারা গেছি। গাড়ীর ভেতর হয় চোর না হয় একটা রাক্ষসী বসে আছে। যদি রাক্ষসী হয় তো আমাদের সর্বস্ব চুরি করে নিয়ে যাবে, আর যদি চোর হয়, তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের খেয়ে ফেলবে, পণ্ডিত।' বলে ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠল।

'আরে দূর।' পণ্ডিত গলা থেকে শকারের হাত ছাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'বলদের গাড়ীতে রাক্ষস্ কোথা থেকে আসবে। বোধ হয়, মধ্যাহ্ন-সূর্যের তাপে তোমার দৃষ্টি বিভ্রম ঘটেছে। দাঁড়াও। আমি

নিজে গিয়ে দেখে আসছি।' বলে পণ্ডিত গাড়ীর দিকে চলে গেল।

বসন্তসেনা ওদিকে গাড়ীর ভেতরে বসেই শকারের আর্তনাদ শুনতে পেয়েছিল। কিন্তু বুঝতে পারছিল না কি করবে। নিশ্চয়ই একটা ভুল হয়েছে।

এই সময় পণ্ডিত এসেই ওকে দেখে সবিষাদে বলে উঠল:

'এ কি ! মৃগী ব্যাঘ্রের অনুসরণ করছে ? হায়। হায়। বসন্তসেনা, এ কাজ তোমার উচিত নয়, উপযুক্তও নয়।'

বসন্তসেনা তাড়াতাড়ি গাড়ী থেকে নেমে এল। 'পণ্ডিতমশাই। ভুলক্রমে শকট উল্টোপাল্টা হওয়ায় এখানে এসে পড়েছি। আমি শরণাগত হলাম। আমাকে রক্ষা করুন।'

'আচ্ছা, আচ্ছা, রোসো।' পণ্ডিত আশ্বস্ত করল বসন্তসেনাকে। 'দেখি, ওই শয়তানটাকে ভাগিয়ে দিতে পারি কিনা।' বলেই ছুটতে ছুটতে শকারের কাছে গিয়ে গলা ফাটিয়ে বলে উঠল: 'শকার। গাড়ীতে সত্যিই একটা রাক্ষসী বসে আছে।'

'ও বাবাগো।' বলেই শকারের কেমন সন্দেহ হলো। পণ্ডিতের পা থেকে মাথা অব্দি দেখে সন্দেহের স্বরেই বলল, 'যদি রাক্ষসীই হয়, তবে তোমার সর্বস্ব চুরি করল না কেন ?—আর যদি চোর হয় তবে তোমাকে খেয়ে ফেললে না কেন ?'

পণ্ডিত বেশ বুঝতে পারল যে বিষকে ঔষধ করে তোলা দুষ্কর। অতএব, বসন্তসেনার কথা বলতেই হবে। তবে একটু কায়দা করে বলা যাক। যাতে মুর্খটা খুশী হয়। নইলে তো আমার পেটের অন্নে টান পড়বে। পণ্ডিত হেসে চোখের ইশারা করে শকারের কানে কানে বলল, 'শকার। আসল কথা কি জানো ? বসন্তসেনা এসেছেন। আর তোমার উদ্দেশ্যেই এসেছেন।'

শকার একেবারে গলে গেলো। বোকার মত ঘর্‌ঘরে গলায় হেসে বলে উঠল, 'বল কি ? আমার উদ্দেশ্যে ? এই মহাত্মা ব্যক্তির উদ্দেশ্যে ? এই মনুষ্য বাসুদেবের উদ্দেশ্যে ? ওহ। আজ আমার অপূর্ব লক্ষ্মীলাভ হল। প্রথমে আমি ওর ওপর রুষ্ট হয়েছিলাম।

এবার তবে ওর পায়ে ধরে সাধি ?'

বসন্তসেনা তখন পণ্ডিতের খোঁজে বাগানের ভেতরে, খানিকটা তফাতে এসেই শকারকে দেখতে পেয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। পালাবার শক্তি নেই যেন।

শকারও ওকে দেখতে পেয়ে একেবারে সটান ওর পায়ের ওপর পড়ে বলে উঠলো, 'হে মাতঃ, অম্বিকে। এই তোমার পায়ে পড়ছি।'

সঙ্গে সঙ্গে বসন্তসেনা ক্লেদাক্ত জীবের স্পর্শে যেন শিউরে উঠে পায়ের এক ঝটকায় শকারকে দূরে ঠেলে দিল। বিরক্তি আর রাগে বলে উঠল, 'সরে যা. অভদ্র, অনার্য কোথাকার।'

'কি। আমাকে—রাজার শালাকে পদাঘাত। দাঁড়া। দেখাচ্ছি।' বলেই চেঁচিয়ে হাঁক দিলে, 'ওরে, ব্যাটা দাস স্থাবরক। একে তুই কোথায় পেলি ?'

দাস স্থাবরক ভয়ে ভয়ে এসে বলতে লাগল: 'প্রভু। আমার কোনও দোষ নেই। গ্রাম্য-শকটে পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় চারুদত্তের গৃহের সামনে শকটটা রেখে আমি সামনের একটা শকটের চাকা কাদা থেকে তুলে দিচ্ছিলাম। সেই সময় বোধ হয় উনি ভুল করে চারুদত্তের শকট ভেবে আমার শকটে উঠে পড়েছিলেন। আমিও ঠিক বুঝতে পারি নি।'

'কি ? ভুল করে এই গাড়ী চড়ে এসেছে ? আমার উদ্দেশ্যে আসেনি ?' শকার এবার কুৎসিৎ ভাষায় গাল পাড়ল—'পাজি নচ্ছার বেটি কোথাকার, তবে তুই সেই দরিদ্র বণিক পুত্রের উদ্দেশ্যে

বসন্তসেনা দৃপ্ত ভঙ্গীতে উত্তর দিল, 'তুমি যে বললে, 'চারুদত্তের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিস্ ?'—এতে আমি নিজেকে অলঙ্কৃত মনে করছি।'

—'অলঙ্কৃত মনে করাচ্ছি তোকে।' শকাব দাঁত কিড়মিড় করে বলে উঠল, 'ঝুঁটি ধরে বরতনু তোর নামাব নিমেষে, জটায়ু করল যথা বালীর পত্নীকে ধরি কেশে।' বুঝলে পণ্ডিত। পূর্বে যার অপমানের কথায় আমার রোষাগ্নি একটু দেখা দিয়েছিল, আজ

তার পদাঘাতে একেবারে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে। এবার তবে এটাকে মারি।' বলেই কোষ থেকে তরোয়াল বার করে তেড়ে গেল বসন্তসেনার দিকে।

'কর কি। কর কি।' বলে পণ্ডিত এসে শকারের হাতে ধর ফেলল। 'অবলা রমণীকে এভাবে মারতে আছে।'

শকার থেমে গিয়ে চোখ ঘুরিয়ে বলল, 'বেশ। তাহলে আমি যা চাই, তাই কর।'

পণ্ডিত বলল, 'আচ্ছা করব—কিন্তু অকার্য্য বর্জন করে।'

'না, না,' শকার একগাল হেসে বলল, 'তাতে অকার্য্যের গন্ধও নেই, রসও নেই।'

'বেশ বল।'

'তুমি বসন্তসেনাকে মেরে ফ্যালো।'

'বল কি! একে অবলা বালা। তায় আমাদের নগর-ভূষণ। এই প্রেমবতী নির্দ্দোষীকে বধ করে কোন্ নায়ে বৈতরণী পার হব?'

'আরে, আমি তোমাকে নৌকো দেব।' শকার সাগ্রহে বলল, 'তাছাড়া, এই নির্জন বাগানে মারলে কে তোমাকে দেখতে পাবে?'

'দেখবে বনের দেবতা, দীপ্ত দিবাকর, আমার অন্তরাত্মা। তা ছাড়া ধর্ম, বায়ু, ক্ষিতি, বোম, পাপ-পুণ্য—সবই সাক্ষী হবে।' পণ্ডিত সভয়ে বললে।

শকারও এত সহজে ছাড়বে না। সে বলল, 'পণ্ডিত। তবে একে কাপড় দিয়ে ঢেকে মারো।'

'মুর্খ। তুমি একেবারে অধঃপাতে গেছো।' পণ্ডিত ধমকে

শকার পণ্ডিতের কাছ থেকে সরে যেতে যেতে গাল দিল, 'এই বুড়ো শুয়োরটা অধর্ম-ভীরু। একে দিয়ে হবে না।' বলেই দাসকে ডাকল। 'বাপু বাছা দাস স্থাবরক। তোকে সোনার বালা দেব।'

দাস বলল, 'যে আজ্ঞে। আমি হাতে পরব।'

'তোকে সোনার পিঁড়ি গড়িয়ে দেব।' শকার আবার বলল।

'যে আজ্ঞে, আমি তাতে বসব।' দাসও উত্তর দিল।

'আমার সব উচ্ছিষ্ট তোকে দেব।'

দাসও বিনীতভাবে বলল, 'আজ্ঞে, আমি পেট ভরে খাব।'

'সকল দাসের সর্দার করে দেব তোকে।'

'যে আজ্ঞে, আমি তা হব।'

'তবে যা বলি শোন্ ;'

দাস স্থাবরক ভয়ে ভয়ে বলল, 'আজ্ঞে, সবই শুনব, কেবল অকার্য্য করব না।'

'দূর। অকার্য্যের গন্ধমাত্র নেই এতে।' শকার স্বর নীচু করে বলল, 'এই বসন্তসেনাকে তুই মেরে ফ্যাল্।'

'প্রভু, রাগ করবেন না।' দাস স্থাবরক বলল, 'ঠাকরুণকে আমি মারতে পারব না।'

'আরে ব্যাটা দাস।' শকার কড়া স্বরে বলল, 'আমার কথা তুই শুন্‌বি না? আমি কি তোর প্রভু নই?'

'আজ্ঞে, আপনি এই দেহটার প্রভু, চরিত্রের প্রভু নন্। আমার বড় ভয় হচ্ছে।' দাস কাঁপতে কাঁপতে বলল।

'আমার দাস হয়ে তোর কাকে ভয়?' শকার আশ্বস্ত করতে চাইল।

'আজ্ঞে, পরলোককে।' দাস ঢোঁক গিলে বলল।

'ও। আমার কথা তুই শুনবি না? তবে রে—বলেই কিল্, চড় লাথি মারতে মারতে দাস স্থাবরককে একেবারে মাটিতে শুইয়ে ফেলে দিল।

ভয়ে বসন্তসেনা চিৎকার করে উঠল। পণ্ডিত কোনক্রমে স্থাবরককে ছাড়িয়ে নিয়ে একপাশে সরে যেতে আগুনঝরা দৃষ্টিতে শকারের দিকে তাকাল। তারপর স্থাবরককে বলল, 'ঠিক বলেছিস্ বাছা দাস। অসৎ রাজার অযোগ্য অনুচর সব। এদের নীতি-জ্ঞানও নেই, ধর্ম ভয়ও নেই। একদিন ধর্মের খাঁড়া ঠিক এদের ঘাড়ে

পড়বে, দেখিস্।'

শকার একেবারে মুখ বিকৃত করে ভেংচে উঠল, 'এই বুড়ো শেয়ালটার অধর্মের ভয়, আর এই কৃত দাসটার পরলোকের ভয়। আমি রাজার শালা—কত বড়লোক। আমার কাকে ভয়?—ওরে ব্যাটা গর্ভদাস। যা ঐ শকটের আড়ালে গিয়ে চুপ করে বসে থাক।'

'যে আজ্ঞে প্রভু।' স্থাবরক অতি কষ্টে যেতে যেতে চাপা স্বরে বসন্তসেনাকে বলে গেল, 'আমার যা সাধ্য, আমি করলাম।'

বসন্তসেনা তখন উত্তর দেবার অবস্থায় নেই। ভয়ে পাথর হয়ে আছে। এইবার না জানি শয়তানটা কি করে। পণ্ডিতমশাই অবশ্য রয়েছেন। কিন্তু তাঁকে কি ভরসা। এই জানোয়ারটার সঙ্গে শক্তিতে কখনই তিনি পেরে উঠবেন না। আর বসন্তসেনা যে ভয় করছিল।—শকার একহাতে তরোয়াল নিয়ে হিংস্র বাঘের মত দাঁত বার করে গুটি গুটি এগিয়ে আসছে। এখনই ঝাঁপিয়ে পড়বে। আতঙ্কে বসন্তসেনা চেঁচিয়ে উঠল, 'পণ্ডিত মশাই। আমাকে রক্ষা করুন।'

'কেউ তোকে রক্ষা করতে পারবে না। এইবার তোকে বধ করব।' বলেই লাফ দিল বসন্তসেনার ওপরে।

সভয়ে পিছিয়ে গেল বসন্তসেনা। পণ্ডিত এসে জড়িয়ে ধরল শকারকে।—'থামো। থামো।'

'তবে রে—' বলেই দেহের এক ঝটকায় পণ্ডিতকে সরিয়ে দিয়েই ঘুরে তরোয়ালের বাঁট দিয়ে মাথায় আঘাত করল। পণ্ডিতের দেহটা থর্‌থর্ করে কেঁপে উঠে অচেতন হয়ে ভূমিতলে লুটিয়ে পড়ল।

আর তাই দেখে বসন্তসেনার দেহ হিম হয়ে গেল। সাহায্যের শেষ আশাটুকুও চলে গেল।

খ্যা খ্যা করে দাঁত বার করে হাসতে হাসতে স্থির লক্ষ্যে বসন্তসেনার দিকে এগুতে লাগল শকার। শিকার ফাঁদে পড়েছে। আর নিস্তার নেই।

বসন্তসেনাও এক পা এক পা করে পেছুতে লাগল।

'কিরে গর্ভদাসী।' শকার এগুতে এগুতেই বলতে লাগল, 'এখনও বল্, আমার অঙ্কশায়িনী হবি কি না?'

'সহকার-তরুকে সেবা করে পলাশ বৃক্ষকে কে চায়?'

'বটে। চারুদত্ত সহকার-তরু, আর আমি পলাশবৃক্ষ, কিংশুকও নই? অ্যাঁ। আমাকে গালাগাল দিয়ে চারুদত্তের নাম করছিস্?'

'যিনি আমার হৃদয়ে আছেন, তাঁর নাম কেন না করব?' উত্তর দিল বসন্তসেনা।

শকার বিদ্রূপ করে বলল, 'বটে। সে তোর হৃদয়ের মধ্যে এখনও আছে? ভালই হল। তোর সঙ্গে তাকেও একত্রে বধ করব। দরিদ্র বণিক কামুকী বেশ্যা কোথাকার।—' বলেই বাঘের মত হুঙ্কার দিয়ে এক লাফে বসন্তসেনার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দুহাতে তার গলা টিপে ধরল। 'নাম কর্, গর্ভদাসী, তার নাম কর্ আরো।' বলে শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে বসন্তসেনার গলায় আঙ্গুলের চাপ দিতে লাগল।

বসন্তসেনার দম্‌বন্ধ হবার আগে 'মহাত্মা চারুদত্তকে প্রণাম', কেবল এই কথাগুলো বলতে পারল। তারপরেই ওর নিস্পন্দ দেহটা শিথিল হয়ে গেল।

'মর্ গর্ভদাসী মর্।' বলে বসন্তসেনার কোমল দেহটা ছেড়ে দিল শকার। লুটিয়ে পড়ল দেহটা বসন্তসেনার ভূমিশয্যায়।

কয়েক মুহূর্ত বসন্তসেনার নিশ্চল দেহটার দিকে চেয়ে থেকে শকার হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠল। একটু দূরে পণ্ডিতের সচেতন দেহটার দিকেও একবার তাকাল। তারপর ভাবল আর এখানে অপেক্ষা করা ঠিক নয়। এই বেলা সরে পড়াই ভাল।

আড়াল থেকে দাস স্থাবরক সমস্ত ঘটনাটা প্রত্যক্ষ করে সময় বুঝে সরে পড়ল। শকার তাকে খুঁজে না পেয়ে একটু চিন্তিতই হল। শেষে ভাবল ব্যাটা গর্ভদাস আমার কি করবে। বরং আড়াল থেকে দেখা যাক পণ্ডিতটা কি করে। ভেবেই একটা বড় গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে পড়ল।

ইতিমধ্যে পণ্ডিতের আস্তে আস্তে চেতনা ফিরল। উঠে বসল সে। মাথায় আঘাতের জায়গায় হাত বোলাল একবার। ফুলে উঠেছে অনেকটা। কিন্তু বসন্তসেনার কি হল? ওই পাষণ্ডটাই বা গেল কোথায়?

দাঁড়িয়ে উঠতেই বসন্তসেনার নিস্পন্দ দেহটার দিকে দৃষ্টি পড়ল। ছুটে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল সে নিশ্চল দেহটার পাশে। ভয়ে, বেদনায় স্তব্ধ হয়ে গেল পণ্ডিত। একটা হাত তুলে দেখল বসন্তসেনার। এখনও উষ্ণ। কিন্তু নিষ্প্রাণ।

ঠিক সেই মুহূর্তে শকার হা হা করে হেসে গাছের আড়াল থেকে এগিয়ে এল। 'একি পণ্ডিত। তুমি সত্যি সত্যিই বসন্তসেনাকে মেরে ফেললে? আমি তো ঠাট্টা করেছিলাম। সত্যিই তো মারতে বলিনি।'

একেবারে ব্রহ্মারন্ধ্রে আগুন ধরে গেল পণ্ডিতের। একটু দূরেই তরোয়ালটা পড়ে আছে দেখেই পণ্ডিত ছুটে গিয়ে সেটা তুলে নিয়ে শকারের দিকে ধাওয়া করল, 'শয়তান। আজ তোরই একদিন কি আমারই একদিন।'

পণ্ডিতের ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখেই উর্ধ্বশ্বাসে চম্পট দিল শকার।

পণ্ডিতও আর বেশী দূর গেল না। ফিরে এসে বসন্তসেনার স্থির দেহটার দিকে আর একবার তাকিয়ে মনে মনে স্থির করল— আর এখানে থাকা নয়। রাজবাড়ীতেও ফেরার পথ বন্ধ হয়ে গেল। তাহলে শর্বিলকের বিপ্লবী দলে যোগ দেওয়াই এখন বাঞ্ছনীয়। ভাবামাত্রই উদ্যানের বহিঃপথের দিকে ছুট দিল।

শকার বেশী দূর যায় নি। পণ্ডিতের ক্ষমতা তো সে জানে। ফিরে এল সে আবার। বসন্তসেনার নিষ্প্রাণ দেহটার দিকে আবার তাকিয়েই চকিত বিদ্যুতের মত একটা মতলব খেলে গেল তার মাথায়! বসন্তসেনা চারুদত্তের আহ্বানে এই পুষ্পকরণ্ডক উদ্যানে আসছিল। সুতরাং, একদা ধনী এখন চরম দারিদ্র্যে বিপর্য্যস্ত চারুদত্তই বসন্তসেনার স্বর্ণালঙ্কারের লোভে তাকে গলা টিপে হত্যা

করেছে। বিচারশালায় এটা প্রমাণ করতে সহজেই পারা যাবে, কারণ দরিদ্রের কি ক্ষমতা আছে যে ধনীর বিরুদ্ধে নিজেকে বাঁচাবে, ব্যস্‌! তাহলেই চারুদত্তের প্রাণদণ্ড শূলদণ্ড। বসন্তসেনা তো গেছেই। এক ঢিলে দুই পক্ষী বধ। খল্‌ খল্‌ করে আপন মনেই হেসে উঠে দৌড়ে গিয়ে শকটে চালকের আসনে বসে উর্ধ্বশ্বাসে রাজবাড়ীর দিকে চালিয়ে দিল।



উজ্জয়িনী নগরীর স্বর্ণচূড়া মণ্ডিত বিশাল বিচারালয়ের প্রধান কক্ষে অর্থি-প্রত্যর্থীর ভীড় আজ তেমন নেই। শুভ্রবেশে, শুভ্র শ্মশ্রু গুম্ফ মণ্ডিত, দক্ষিণ হস্তে ন্যায়দণ্ড নিয়ে বিচারক তাঁর আসনে সমাসীন। তিনি মৃদুস্বরে পার্শ্বে উপবিষ্ট প্রধান করণিক শোধনকে বললেন: 'কার্য্যার্থী কে কে আছেন, তাদের আহ্বান কর।'

'যে আজ্ঞে', বলে শোধনক আহ্বান করতেই উজ্জ্বল বেশধারী রাজার শ্যালক সংস্থানক তথা শকার উপস্থিত হয়ে বণিক চারুদত্তের বিরুদ্ধে তার অভিযোগ নিবেদন করল।

বিচারক অখণ্ড মনোযোগে রাজশ্যালক শকারের অভিযোগ শুনলেন। তারপর আবার শোধনকে নিম্নস্বরে বললেন, 'এখনই প্রহরী এবং শকট পাঠিয়ে প্রথমে বসন্তসেনার মাতাকে এবং পরে বণিক চারুদত্তকে কোন প্রকার উদ্বিগ্ন না করে বিচারশালায় নিয়ে আসুক।' তারপর তিনি শকারের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন: "আপনি কেন পুষ্পকরণ্ডক উদ্যানে গিয়েছিলেন?'

শকার উত্তর দিল 'আমার ভগ্নীপতি আমার ওপর তুষ্ট হয়ে সেই উদ্যানটি আমাকে দেন। সেখানে জল শুকানো জমি ভরাট করানো, ঝাঁট দেওয়ানো, ডালপালা ছেঁটে ফেলানো—এইসব নানা কাজের তদারক করতে প্রতিদিন আমাকে সেখানে যেতে হয়। তা সেদিন গিয়ে দেখি একজন স্ত্রীলোকের মৃতদেহ পড়ে আছে।'

বিচারক প্রশ্ন করলেন, 'সেই স্ত্রীলোকটির পরিচয় কি আপনি জানেন?'

'তা আর জানি না,' শকার একগাল হেসে বলল, 'সেই নগর ভূষণ-শত-কাঞ্চন-ভূষিতা রমনীকে কেনা জানে ? কোন কুপুত্র অর্থের লোভে উদ্যানে প্রবেশ করে বসন্তসেনাকে গলা টিপে মেরেছে।'—

'আপনি কি করে জানলেন যে অর্থের লোভে তাঁকে গলা টিপে মেরেছে ?' বিচারক আবার প্রশ্ন করলেন।

শকার বলল, 'গলায় যেখানে অলঙ্কার থাকার কথা, সেখানে তা নেই, গলাটাও ফুলে উঠেছে। তাই থেকে অনুমান করলাম।'

'তা বটে।' বিচারক স্বগতোক্তি করলেন।

এই সময় প্রহরী সংবাদ দিল যে বসন্তসেনার মা এসেছেন।

বসন্তসেনার বৃদ্ধ মা বিচারকক্ষে প্রবেশ করতে বিচারক কোমল স্বরে বললেন, 'এসো বাছা! বসো। অল্প কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করে তোমাকে ছেড়ে দেবো।—এখন বলো তো তুমি কি বসন্তসেনার মা!'

বৃদ্ধা উত্তর দিল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'বেশ।' বিচারক বললেন, 'বসন্তসেনা এখন কোথায় ?'

বৃদ্ধা একটু ইতঃস্তত করতে লাগল দেখে শোধনক বলল: 'এ বিচারের প্রশ্ন। এতে কোন দোষ নেই। বল!'

তখন বৃদ্ধা বলল, 'খ্যাতনামা শ্রীযুক্ত চারুদত্ত, বণিক পটিতে তাঁর নিবাস। সেইখানে আমার কন্যা যাতায়াত করেন।'

'বিচারপতি মহাশয় শুনলেন তো ?' শকার সহর্ষে বলল, 'একথা গুলো লিখে নিন্। সেই চারুদত্তের সঙ্গেই আমার বিবাদ।'

বিচারপতি বৃদ্ধাকে আর প্রশ্ন করা নিরর্থক ভেবে চলে যেতে আদেশ করলেন।

বৃদ্ধা চলে গেল।

সেই সময় প্রহরীর সঙ্গে চারুদত্ত বিচারকক্ষে উপস্থিত হলেন। তাঁকে দেখে বিচারক সাদরে আহ্বান জানালেন: 'আসুন মহাশয়। বাপু শোধনক। ওঁকে বসতে আসন দাও।'

চারুদত্ত আপন চিন্তার ভাব গোপন রেখে আসনে বসলেন।

বিচারপতি তখন বললেন : 'কোন কথার প্রসঙ্গে আবশ্যক হওয়ায় আপনাকে এই বিচারালয়ে আহ্বান করেছি।'

চারুদত্ত বললেন : 'বিচারপতি মহাশয়ের কল্যাণ হোক।'

বিচারপতি এবার সরাসরি প্রশ্ন করলেন, 'আর্য চারুদত্ত! নগর-নটী বসন্তসেনাকে আপনি অবশ্যই চেনেন? তাঁর সঙ্গে আপনার কোন প্রসক্তি, প্রণয় কিম্বা প্রীতি আছে কি?'

চারুদত্ত বিচারকের সরাসরি প্রশ্নে ঈষৎ বিচলিত হয়ে পড়লেন। সহসা তাঁর মুখে কোন উত্তর যোগালো না।

তাঁকে চুপ করে থাকতে দেখে, শোধনক কোমল স্বরে বলল : 'চারুদত্ত মহাশয়! বলুন! লজ্জা করবেন না। এ হচ্ছে বিচারঘটিত প্রশ্ন।'

চারুদত্ত উত্তর দিলেন : 'কি হেতু আমার বিচার? কার অভিযোগেই বা বিচার?'

শকার সদর্পে বলল, 'আমার অভিযোগে বিচার।'

'তোমার অভিযোগের সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক।' চারুদত্ত সহসা জোর দিয়ে বলে উঠলেন।

'এক্ষুনি জানতে পারবে কি সম্পর্ক।' শকার দম্ভ ভরে তাকাল বিচারকের দিকে।—'এই যে বিচারপতি মহাশয়। বলে দিন, অভিযোগটা কি?'

বিচারপতি শান্ত স্বরে বললেন, 'ভদ্র চারুদত্ত। আপনি ওই শকারের কথায় দেবেন না। সঠিক সত্য বলুন। নগরনটী বসন্তসেনা কি আপনার মিত্র?'

চারুদত্ত স্বীকার করলেন, 'হ্যাঁ।'

বিচারপতি প্রশ্ন করলেন, 'তিনি এখন কোথায়?'

'তিনি গৃহে ফিরে গেছেন।' চারুদত্ত বললেন।

শোধনক তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন করল : 'কিরূপে গেলেন? কখন গেলেন? কার সঙ্গেই বা গেলেন? সব কথা স্পষ্ট করে বলুন, আর্য?'

চারুদত্ত বললেন, 'তিনি গৃহে গেছেন, এছাড়া আর কি বলতে পারি।'

'ওরে পাপিষ্ঠ, আর মিথ্যা বলিস্ না,' শকার সদর্পে হুঙ্কার দিয়ে উঠল, 'পুষ্পকরণ্ডক উদ্যানে প্রবেশ করে অর্থলোভে, গলা টিপে বসন্তসেনাকে তুই বধ করেছিস্। আর এখন বলছিস্ কিনা গৃহে গেছেন?'

'আঃ।' চারুদত্ত বিরক্তি ভরে প্রতিবাদ করে উঠলেন: 'কি অসম্বন্ধ প্রলাপ বকছ?'

বৃদ্ধ ন্যায়াধীশ আপন অজ্ঞাতসারেই মাথা নেড়ে বলে উঠলেন, 'না, না, চারুদত্ত মহাশয় কেমন করে এ অকার্য করবেন! এমন পাপাচরণ তিনি করতে পারেন না। তিনি মহাত্মা সুজন।'

চারুদত্ত স্বস্তির স্বরে বলে উঠলেন, 'মহানুভব বিচারকের মঙ্গল হোক।'

শকার একেবারে ক্ষেপে গেল। '—কি? পক্ষপাত করে বিচার করা হচ্ছে? বিচারক। সাবধান। আমার ভগ্নিপতি রাজা পালককে বলে তোমাকে কর্মচ্যুত করাবো।'

বিচারক তাঁর বাঁ হাতে ধুলো ঝেরে ফেলার মত তাচ্ছিল্যের ভঙ্গী করলেন। শকারের কথা গ্রাহ্যও করলেন না। তিনি পুনরায় চারুদত্তকে প্রশ্ন করলেন: 'ভদ্র চারুদত্ত। আপনি কি বলতে পারেন যে সেই নগরনটী পদব্রজে গিয়েছিলেন, না শকটে?'

চারুদত্ত বিনীত স্বরে উত্তর দিলেন: : 'আমি তো স্বচক্ষে দেখি নি। তাই আমি বলতে পারি না তিনি কিভাবে গিয়েছিলেন।'

ঠিক সেই মুহূর্তে একজন নগররক্ষী হুড়মুড়্ করে বিচার কক্ষে ঢুকে পড়ে বিচারকের পায়ের কাছে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ে হাঁফাতে লাগল!

বিচারকার্য্যে অকস্মাৎ বিঘ্ন ঘটায় বিচারক বিরক্ত হলেন। তাঁর বাম ভ্রূ-তে কুঞ্চন দেখা দিল। রক্ষীকে অবশ্য তিনি চিনতে পারলেন। বিরক্ত ভরেই জিজ্ঞেস করলেন, 'নগররক্ষীদের প্রধান বীরক? তোমার

এখানে কি প্রয়োজন?'

বীরক হাঁফাতে হাঁফাতেই সসম্ভ্রমে বলল, "বিচারপতি মহাশয়! যে আর্যক কারাগার থেকে পালিয়েছে, তাকে খুঁজতেই আমরা নিযুক্ত ছিলাম। সেই সময় পথ দিয়ে একটি শকট যাচ্ছে দেখে আমি থামাই। আমার ওপরওলা সর্দার চন্দনক শকট তল্লাসী করে দেখে ছেড়ে দিতে চায়। তখন 'আমিও দেখব' একথা বলায় চন্দনক আমাকে যা খুশী গাল দেয়, শেষে লাথি মারে।—আমি তো রাজকার্যই করছিলাম। আমি এর বিচার চাই!'

'তা বাপু। রাজদ্বারে গেলেই তো পারতে। সেখানেই তো তোমাদের অভিযোগাদি করার নিয়ম?' বিচারপতি ঈষৎ বিরক্ত স্বরে বললেন।

বীরক তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, 'আজ্ঞে হাঁ, সেখানেই প্রথমে গিয়েছিলাম। কিন্তু সেখানে এখন বিশৃঙ্খল অবস্থা। শুনতে পেলাম আর্যকের ভয়ে রাজা সপার্ষদ রাণীদের মহলে আত্মগোপন করেছেন।'

'কি? ব্যাটা বীরক তোর এত আস্পর্ধা। রাজা ভয়ে আত্মগোপন করেছেন, একথা তুই সর্বজন সমক্ষে বলে দিলি?' একেবারে হুঙ্কার দিয়ে উঠল শকার! 'দাঁড়া! তোর ব্যবস্থা করব আমি। আগে এই বিচারপর্বটা মিটুক।'

বীরক এবার সভয়ে উঠে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে বলল: 'আজ্ঞে শ্যালক মশাই। আমার কি দোষ। সারা উজ্জয়িনীতেই যে খবরটা রটে গেছে।'

'চোপ।' শকার আবারও চোখ পাকিয়ে হুঙ্কার দিল।

ন্যায়াধীশ দুজনকেই চুপ করতে বলে তারপর বীরককে সম্বোধন করে বললেন, 'বীরক্। তোমার অভিযোগের বিচার পরে হবে। আপাততঃ বিচারশালার বাইরের দ্বারে যে অশ্ব আছে, তাতে আরোহণ করে বসন্তসেনার গৃহে গিয়ে দেখে এসো তিনি ফিরেছেন কি না। না ফিরলে, একবার পুষ্পকরণ্ডক উদ্যানেও সন্ধ্যান নিয়ে

এসো। দ্রুত যাবে আসবে। যাও।'

বীরক প্রণাম করে চলে যেতে উদ্যত হতেই বিচারক হাত তুলে তাকে থামতে বলে প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা, বীরক। যাবার আগে একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাও।—তুমি যে শকটটিতে তল্লাসি করতে চেয়েছিলে, তুমি কি জানো, সে শকটটি কার?'

বীরক সসম্ভ্রমে উত্তর দিল: 'আজ্ঞে হ্যাঁ, জানি। চালক বলেছিল যে শকটটি চারুদত্ত মহাশয়ের। বসন্তসেনা আরোহীনী, পুষ্পকরণ্ডক উদ্যানে আমোদ প্রমোদের জন্য তাঁকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।"

শকার এই কথা শুনে একেবারে আহ্লাদে লাফিয়ে উঠে হাউ হাউ করে বলে উঠল: 'শুনলেন তো, শুনলেন তো বিচারপতি মহাশয়? এবার তাহলে চারুদত্তকে শাস্তি দিন।'

বিচারপতি গম্ভীর মুখে চারুদত্তের রক্তহীন বিষণ্ণ মুখের দিকে একপলক দৃষ্টিক্ষেপ করে বীরককে ইশারা করে বললেন, 'যাও'।

শকার তৎক্ষণাৎ এগিয়ে গিয়ে গমনরত বীরকের কানে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, 'বীরক। তোকে আর শাস্তি দেব না। পুরস্কার দেব। তুই সত্যিকথা বলেছিস্‌ বলে। হি-হি।'—

বীরক কিছুই না বলে দ্রুত চলে গেল।

বিচারক স্বগতোক্তি করলেন, ওহ্‌। বিচারের অনুমানে ও বাস্তব ঘটনায় কতই না বৈষম্য। আমিও বিভ্রান্তিতে পড়ে যাচ্ছি। পরমুহূর্তেই নিজেকে সংযত করে নিয়ে তিনি আবার চারুদত্তকে প্রশ্ন করলেন, 'ভদ্র চারুদত্ত। এবার সত্য কথা বলুন। বুঝতেই পারছেন। আপনার ওপর বসন্তসেনাকে হত্যা করার এবং তা গোপন করার দায় বর্তাচ্ছে।'

চারুদত্ত বুঝতে পেরেছিলেন; এবং সেজন্য অত্যন্ত বিচলিত বোধ করলেন। বললেন, 'মাননীয় বিচারপতি। অনেকক্ষণ হল আমার সখা মৈত্রেয়কে বসন্তসেনার সমাচার জানবার জন্য পাঠিয়েছি। তা এখনও কেন সে আসছে না কেন এত বিলম্ব করছে, বুঝতে পারছি

না। মনে করি, সে এলেই সত্য নির্ধারণ হবে।'

ঠিক সেই মুহূর্তেই মৈত্রেয় উর্ধশ্বাসে বিচারকক্ষে প্রবেশ করেই বিচারককে উদ্দেশ করে বলল, 'ন্যায়াধীশের কল্যান হোক।' বলেই উদ্বিগ্নভাবে চারুদত্তের বিষন্ন, বিচলিত মুখের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'সখা। তোমাকে এমন মলিন দেখাচ্ছে কেন? এখানেই বা আহুত হলে কেন? গায়ক রেভিল পথে আমাকে বললে। তাই জানতে পেরেই এখানে ছুটে এসেছি। সব মঙ্গল তো?'

চারুদত্ত কেবল বলতে পারলেন, 'না সখা। ঘোর অমঙ্গল। আমি নাকি সেই হতভাগীনী বসন্তসেনাকে, সেই রতিদেবীতুল্য ললনাকে নিজ হাতে হত্যা করেছি।'

মৈত্রেয় অবাক বিস্ময়ে বলে উঠল, 'কে, কে বলছে একথা? কে সে পাপিষ্ঠ?'

'ওরে বাম্‌না ভুত,' শকার সদর্পে বলে উঠল, 'আমি বলেছি। তোর সখাকে তুই জিজ্ঞেস করনা, অলঙ্কারের লোভে, পুষ্পকরণ্ডক উদ্যানে, বসন্তসেনাকে গলা টিপে মেরেছে কিনা?'

প্রচণ্ড রাগে মৈত্রেয় একেবারে দিশাহারা হয়ে পড়ল। চীৎকার করে বলে উঠল: 'ওরে কুলটা পুত্র রাজ-শ্যালক সংস্থানক! ব্যাটা স্বুবর্ণ মণ্ডিত মর্কট। তুই এইরকমভাবে সখার নামে মিথ্যা অভিযোগ করছিস? যে সখা আমার ফুল তোলবার জন্য মাধবীলতাটিকেও ধরে টানেন্ না,—পাছে তার পাতা ছিঁড়ে যায়, তিনি কিনা এমন উভয়-লোক বিরুদ্ধ অকার্য্য করবেন? রোস্ কুট্‌নীপুত্র, রোস্, এই বাঁকা লাঠিটা দিয়ে তোর মাথাটা গুঁড়ো করে ফেলি আমি।'

শকারও সক্রোধে হুঙ্কার দিয়ে উঠল, 'মহাশয়রা শুনুন। চারু-দত্তের সঙ্গে আমার বিবাদ, কিম্বা তার নামে আমার অভিযোগ; সেখানে এই কাকপদ-মস্তক বিটকেল বামুনব্যাটা বলে কিনা আমার মাথা গুঁড়ো করে দেবে? ব্যাটা দাসীপুত্র পরান্নভোজী বিটলে বামুন, তার কত আস্পর্ধা? যাকগে। আপনারা বিচারকার্য চালিয়ে যান! এ ব্যাটা উচ্ছন্নে যাক।'

'কে উচ্ছন্নে যায়, দেখাচ্ছি তোকে।' বলে রাগে অস্থির হয়ে যেমন হাতের বাঁকানো লাঠিটা তুলে শকারকে মারতে গেল মৈত্রেয়, তৎক্ষণাৎ তার বগলের নীচে চেপে রাখা, লাল চেলির কাপড়ে বেঁধে রাখা বসন্তসেনার অলঙ্কারের পুঁটুলিটা ধপ্ করে ভূমিতে আছড়ে পড়ল।'

সঙ্গে সঙ্গে শকার এগিয়ে এসে ছোঁ মেরে তুলে নিল পুঁটুলিটা। চেলির স্বচ্ছ আবরণের নীচে ঝকঝকে স্বর্ণালঙ্কারগুলি দৃশ্যমান। দেখতে দেখতে শকারের মুখে তৃপ্তির এবং বিজয়ীর হাসি ভেসে উঠল।

ওদিকে ঘটনার আকস্মিকতায় মৈত্রেয় স্তব্ধ হয়ে গেল। চারুদত্ত আর্তনাদ করে উঠলেন, 'সখা। এ কি হয়ে গেলো?।'

আর শকার আনন্দে লাফিয়ে উঠে অলঙ্কারের পুঁটুলিটা বিচারকের হাতে তুলে দিয়ে বলে উঠল, 'দেখুন। দেখুন। বিচারপতি মহাশয়। এই সেই অলঙ্কারগুলি। সেই স্ত্রীলোক বেচারীর, যাকে অর্থের লোভে ওই চারুদত্ত বধ করেছে।'

বিচারক অলঙ্কারগুলি দেখে পাশে বসা শোধনকের হাতে দিলেন। শোধনকও দেখল। তারপর পুঁটুলিটা রেখে চারুদত্তকে প্রশ্ন করল, 'এই অলঙ্কারগুলি কি চারুদত্ত মহাশয়ের?'

চারুদত্ত বলে উঠলেন, 'না, না, আমার নয়।'

'তবে এগুলি কার?' শোধনক আবার প্রশ্ন করল।

'এগুলি সেই দেবতাদের প্রিয়, অনুপমা দুর্ভাগিনী বসন্তসেনার।'

এইবার বিচারক কঠিন স্বরে প্রশ্ন করলেন, 'এই অলঙ্কারগুলি তাঁর অঙ্গচ্যুত হ'ল কি করে?'

চারুদত্ত সংযত স্বরে উত্তর দিলেন, 'তিনি স্বেচ্ছায় আমার পুত্র রোহসেনকে এগুলি দান করেছেন।'

মৈত্রেয়ও সখা চারুদত্তের কথায় সমর্থন জানাল।

চারুদত্তের কথা শেষ হতে না হতেই শকার একেবারে উন্মত্তের মত চীৎকার করে বলতে লাগল, 'ওরে পাপিষ্ঠ, দরিদ্র বণিক।

তুই আমার উদ্যানে প্রবেশ করে, বসন্তসেনাকে গলা টিপে হত্যা করে এই অলঙ্কারগুলি হস্তগত করলি—এখন এখানে মিথ্যে বলছিস্ কিনা স্বেচ্ছায়—'

বৃদ্ধ বিচারকও ঘটনাচক্রে বিচলিত হয়ে প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বলে উঠলেন, 'চারুদত্ত। এখনও সত্য বলুন।'

বিচারপতির প্রচণ্ড ধমকে সমগ্র বিচারকক্ষে মুহূর্তে এক গম্ভীর স্তব্ধতা নেমে এল! কেউ কোনও বাক্যস্ফুরণ করতে সাহস পেল পেল না। কেবল বিচারক এবং চারুদত্তের দিকে তাকিয়ে রইল সবাই। চারুদত্ত নিজেও পরিস্থিতির সম্যক গুরুত্ব বুঝে কি বলবেন বিচারকের প্রশ্নের উত্তরে, তাই ভাবছিলেন।

এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে নগররক্ষী বীরক আবার প্রবেশ করল। আভূমি নত হয়ে বিচারককে প্রণাম করে বলল, 'মাননীয় বিচারপতি। বসন্তসেনার গৃহে গিয়ে জানলাম তিনি ফেরেন নি। তারপর পুষ্পকরণ্ডক উদ্যানেও তাঁকে দেখতে পাইনি। তবে স্থানীয় কয়েকজন, যারা উদ্যানের দীঘিতে গোপনে স্নানাদি করতে আসে, এমন কয়েকজন বলল যে একজন স্ত্রীলোকের মৃতশরীর হিংস্র পশুরা ভক্ষণ করেছে, তারা দেখেছে। মানুষের সাড়া পেয়ে পশুরা দেহটাকে টেনে নিয়ে গভীর বনের ভেতর চলে যায়।'

শোধনক বলে উঠল, 'তারা কি করে জানল যে সেটি স্ত্রীলোকের শরীর?'

বীরক বলল, 'চুল, হাত, পা ইত্যাদি অঙ্গের অবশিষ্ট অংশ যা পড়ে ছিল, তাই দেখে।'

বিচারপতি গম্ভীর স্বরে বীরককে বললেন, 'যাও। কক্ষের বাইরে অপেক্ষা করো।'

বিচারপতি আবার তাকালেন চারুদত্তের শোকার্ত, পাংশুবর্ণ মুখের দিকে। অনেকখানি সংযত স্বরে বললেন, 'আর্য চারুদত্ত। বিচার নিষ্পত্তির দুটি পদ্ধতি আছে। এক, বাক্য-অনুসারী—আর এক, অর্থ-অনুসারী। যা বাক্য অনুসারী, তা অর্থি-প্রত্যর্থীদের বাক্যের

দ্বারাই নিষ্পত্তি হয়। আর যা অর্থ-অনুসারী, তা বিচারপতির বুদ্ধির দ্বারা নিষ্পত্তি হয়।—আমার বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করবেন না। আপনি এখনও সেই শকটের আরোহী কে ছিল, তা বলেন নি। এবং বসন্তসেনা যে আপনার কথা মত গৃহে ফেরেন নি—তাও প্রমাণিত। এর পরও যদি সত্য না বলেন, তা হলে কশাঘাতে সত্য নির্ধারণ করতে আমি বাধ্য হব।'

চারুদত্ত উদ্‌গত আবেগ এবং অশ্রু রোধ করে কোন মতে বলে উঠলেন, 'আমি নিরপরাধ।' তারপর স্বগত কণ্ঠে বলতে লাগলেন, 'বসন্তসেনার বিরহে আমার জীবনেরই বা আর কি—প্রয়োজন?'

বিচারপতি শেষবারের মত প্রশ্ন করলেন, 'এই আপনার শেষ কথা?'

চারুদত্ত বিনীত স্বরে বললেন, 'হ্যাঁ, এর চেয়ে অধিক আর কি বলব?'

শকার কিন্তু অত সহজে ছেড়ে দেবার পাত্র নয়। চারুদত্তকে নিজমুখে স্বীকার না করিয়ে সে ছাড়বে না। সে বলে উঠল, 'অধিক কিছু বলতে হবে না। বল্‌বি-হত্যা করেছিস্‌। নিজ মুখেই বলে ফ্যাল্‌, 'হ্যাঁ, আমিই হত্যা করেছি?'

চারুদত্ত অস্থির হয়ে বলে ফেললেন, 'তুমিই তো তা বল্‌ছ, আমার আর বলার কি প্রয়োজন?'

শকার একেবারে মহা কোলাহল করে দাপাদাপি শুরু করে দিল ঃ—'শুনুন ধর্মাবতার। ও নিজ মুখে স্বীকার করল যে ওই হত্যা করেছে। এবার তো সমস্ত সংশয় দূর হল? এবার তবে এই হতভাগার প্রতি শারীরিক দণ্ডের বিধান হোক্‌?'

বিচারক অবশ্য শকারের কথার প্রতি ভ্রূক্ষেপও করলেন না। কিন্তু আর কোনও ভাবেই চারুদত্তের প্রতি কৃপা দেখানো যে সম্ভব নয়, তাও তাঁকে মনে মনে মেনে নিতে হল। অগত্যা, নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বেও তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত জানালেন। বললেন ঃ 'বিচার-ব্যবস্থার মান অনুযায়ী চারুদত্তকে দোষী সাব্যস্ত করা হল। রাজপুরুষগণ।

চারুদত্তকে বন্দী কর।'

আহ্লাদে আটখানা হয়ে শকার নৃত্য করতে করতে বলল, 'এইবার আমার মনের মত কাজ হয়েছে। এবার আমি যাই।' বলে যেতে গিয়েই থেমে গেল।

প্রাজ্ঞ ন্যায়াধীশ তখন চারুদত্তকে বলছেন: 'চারুদত্ত। দোষী, নির্দোষ অবধারণ করা আমাদের কার্য্য; সে কার্য্য সম্পন্ন হয়েছে। শেষে আছে রাজার বিধান। শোধনক। তুমি চণ্ডালদের অবগত কর। রাজাজ্ঞা অনুসারে চারুদত্তের দণ্ডবিধান হবে।'

বিচারক আসন ত্যাগ করে চলে গেলেন। শোধনক চলে গেল। রাজপুরুষগণ এগিয়ে এল চারুদত্তকে নিয়ে যেতে।

মৈত্রেয় অশ্রুরুদ্ধস্বরে 'সখা।' বলে চারুদত্তের পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ল। চারুদত্ত তাকে সযত্নে ধরে তুললেন।—বললেন, 'সখা মৈত্রেয়। যাও। আমার নাম করে তুমি আমার মাকে অন্তিম-কালের প্রণাম দিয়ে এসো। আর দেখো। আমার পুত্র রোহসেনকে তুমিই প্রতিপালন করো।'

রাজপুরুষরা এগিয়ে এল। মৈত্রয়কে বলল, 'ব্রাহ্মণ। এবার আপনি যান! আসুন চারুদত্ত।' বলে চারুদত্তকে বন্দীশালার দিকে নিয়ে গেল।



দক্ষিণ-শ্মশানের পথে আজ সমগ্র উজ্জয়িনী নগরী ভেঙ্গে পড়েছে। সম্মুখে বা পশ্চাতে যতদূর দৃষ্টি যায়, কেবল মানুষ আর মানুষ। নরনারী, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা কেউই আজ আর ঘরে নেই। নগরীর কোথাও আজ আমোদ-আহ্লাদের কোনও চিহ্ন তো নেই বটেই এমন কি দৈনন্দিন পূজা-পাঠও আজ বন্ধ। যেমন ঘরে ঘরে তেমনই মন্দিরে মন্দিরে। ঘরে ঘরে আজ অরন্ধন এবং উপবাস। এই নগরীর শ্রেষ্ঠ নাগরিক, সজ্জন চারুদত্ত মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন। তাই দুজন চণ্ডাল তাঁকে বধ্যভূমিতে নিয়ে চলেছে। আগে আগে ঢাঁড্‌ড়া দিতে দিতে রাজঅনুচরগণও চলেছে। এখন বিশাল জনারণ্যের মাঝখানে পড়ে গেছে তারা। সামনে বিশাল জনস্রোত, মধ্যে চারুদত্ত সহ দুজন চণ্ডাল ও রাজঅনুচরগণ, এবং তাদের পশ্চাতেও নগরবাসীদের বিরাট মিছিল। কিন্তু, সকলেই নীরব। কথা বলার বা শোনার মত অবস্থা কারো নয়। কেবল মাঝে মাঝে গুঞ্জন উঠছে 'মহান চারুদত্ত স্বর্গবাসী হও!' আর সে কথা শুনে ক্রন্দনরতা রমনী কুলের কান্নার শব্দ ক্ষণেকের জন্য আকুল হয়ে চরাচর স্তব্ধ করে দিচ্ছে। রাজপথের দুই পাশের বৃক্ষ-গুলিতে আজ আর সুজন-পাখীরা কলরব করছে না। কেবল মাঝে মধ্যে বায়স-কণ্ঠের কর্কশ আওয়াজ নাগরিকগণের বুকে ঘোর অমঙ্গলের মত এসে বাজছে।

এরই মধ্যে একজন চণ্ডাল অপর চণ্ডালকে চাপাস্বরে বলে উঠল: 'ওরে আহীণ্ড। আমার কেমন মনে হচ্ছে জানিস্। কৃতান্ত আদেশে আজ চারুদত্তের প্রাণ যাবে। তাই দেখে যেন বাতাস

থেমে গেছে, বিনা মেঘে ভূমে বাজ পড়ছে, আর আকাশও কাঁদছে।'

অপর চণ্ডাল বলে উঠল: 'ওরে গুহ! আকাশ কাঁদছে না, বিনা মেঘে বজ্রপতনও হচ্ছে না; মেঘের অঙ্গনা যত, তারা শুধু অশ্রুধারা বর্ষন করছে! দেখ্‌ছিস্‌ না, চারুদত্তকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাচ্ছি দেখে রমণীকুল কাঁদছে! তাদের অশ্রুজলে পথ সিক্ত হয়ে গেছে! তাই ধূলি উঠছে না পথ থেকে এত লোকের পাদচারণাতেও।'

চারুদত্ত, সর্বগাত্রে রক্ত-চন্দন আর তিল-তণ্ডুলাদি পেষণ করে মাখানো এবং কুঙ্কমাদি চূর্ণ করে সর্বাঙ্গে ছিটিয়ে দিয়ে যেন মানুষকে বলির পশুর মত সাজিয়েছে, চলেছেন তিনি চণ্ডালদ্বয়ের মধ্যখানে থেকে, ধীর পদক্ষেপে, নতমস্তকে, আপন শূলদণ্ড দক্ষিণ হস্তে ধরে। তাঁর মনের তটে থেকে থেকে চিন্তার লহরী আছড়ে পড়ছে। কেবলই বসন্তসেনাকে মনে পড়ছে! হা! প্রিয়ে। হা বসন্তসেনা। বিমল জ্যোৎস্নার মত শুভ্র দশনপাঁতি তোমার, ওষ্ঠাধর, আহা, নব-পল্লবের মত; অমৃত সমান সে মুখ-মধু আমি পান করেছি কত। এখন এই অযশ-বিষ কি করে পান করি, বল! হঠাৎ, তাঁর চিন্তাধারা ছিন্নভিন্ন করে এক বালকের করুণ আর্তস্বর ভেসে এল: 'হা পিতঃ। হা পিতঃ।'

শুনেই চারুদত্ত সচকিত হয়ে চণ্ডালদের লক্ষ্য করে সকরুণ ভাবে বললেন, 'বাপু। স্বজাতির মধ্যে তোমরা অতি ভাল লোক। তোমাদের কাছে আমি একটি ভিক্ষা চাই।'

চণ্ডালদ্বয় হাত জোড় করে শশব্যস্তে বলে উঠল: 'ব্রাহ্মণ হয়ে আমাদের কাছে ভিক্ষা?'

চারুদত্ত বললেন: 'শিব শিব। তোমরা কি চণ্ডাল? যারা আচরণে অসৎ তারাই চণ্ডাল, ব্রাহ্মণ হলেও। যে দুরাচার রাজা পালক সত্য মিথ্যা কিছুই পরীক্ষা করলে না, সেই চণ্ডাল। রাষ্ট্র বিপ্লবের পরমলগ্ন সমাগত। তারও পতন অনিবার্য। তার পরলোকার্থেই আমি পুত্রমুখ দর্শনের প্রার্থনা করছি।'

ততক্ষণে নেহাৎই বালক রোহসেন ছুটে এসে পিতার বুকে ঝাঁপিয়ে

পড়ে। 'হা পিতা। হা হা পিতা।'

'হা পুত্র। হা পুত্র।' বলে চারুদত্ত করুণ স্বরে হাহাকার করে ওঠেন। 'ওহ্। কি কষ্ট।' অবশেষে নিজেকে খানিক সংযত করে তিনি আপনমনেই বলে ওঠেন, এখন আমি পুত্রকে কি দিয়ে যাই। কি ভেবে, গলা থেকে যজ্ঞোপবীতটি খুলে রোহসেনের কচি হাতে তুলে দেন। 'এই নাও পুত্র। তোমার হতভাগ্য পিতার স্মৃতিচিহ্ন, এই মুক্তাহীন অস্বর্ণ-ভূষণ ; যার দ্বারা পিতৃগণের পূজাভাগ অর্পণ করেছি। তুমিও তাই ক'রো।'

চণ্ডালদের একজন এই করুণ দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে বলে উঠল : 'চারুদত্ত! এবার তবে চল! আর সময় নষ্ট করা যায় না।'

বালক রোহসেন মুখ ফিরিয়ে বলে উঠল—'ওরে চণ্ডাল। আমার বাবাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস?'

একজন চণ্ডাল উত্তর দিল, 'বাছা! এ ব্যাপারে আমরা অপরাধী নই।'

'তবে কেন মারছ বাবাকে?' বালক রোহসেন বলল।

চণ্ডাল বলল, 'বাছা আমরা নই। এ বিষয়ে রাজাজ্ঞাই অপরাধী।'

বালক বলে উঠল : 'তোমরা আমাকে বধ কর, বাবাকে ছেড়ে দাও।'

'না, না, বাছা! তুমি চিরজীবী হও!' বলেই চণ্ডাল আশপাশের লোকজনদের দিকে বালককে ঠেলে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'সরে যান, সরে যান, মহাশয়েরা, সরে যান। কি আর দেখছ তোমরা? সরে যাও। ইনি পুরুষ সজ্জন, অপবাদ বশে এঁর যায় গো জীবন, ছিন্ন রজ্জু স্বর্ণ কুম্ভ কুপে নিমজ্জন। সরে যাও, সরে যাও সব।'

  

ঢ্যাড্‌রা পেটার শব্দ কানে যেতেই চিলে কোঠায় বন্দী, শকারের ভৃত্য স্থাবরক অস্থির হয়ে উঠল। বুঝতে পারল যে চারুদত্তকে চণ্ডালরা বধ্যভূমির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। তার দুপায়ে শেকল বাঁধা।

হাত দুটো যদিও খোলা। সে লাফিয়ে লাফিয়ে ভাঙ্গা জানালাটার কাছে এসে উঁকি দিল। রাজপথ লোকারণ্য। সবাই নতমস্তকে চলেছে। সে মনে মনে ভাবল—বসন্তসেনাকে হত্যা করলে শকার আর সেই অপরাধে সাধু-সজ্জনের যিনি আশ্রয়, সেই চারুদত্ত মহাশয়ের প্রাণ যাবে। তাঁর চেয়ে বরং আমি মরি, সেও ভাল। ভেবেই সে জানালা গলে নেমে পড়ল। পা দুটি শেকলে বদ্ধ। তবু, হাতের সাহায্যে কার্ণিশ্ বেয়ে বেয়ে সাত তলার ওপর থেকে দোতলার কার্ণিশে নেমে এল। তারপরেই হঠাৎ হাত ফসকে নীচে, বাগানের নরম মাটিতে আছড়ে পড়ল। প্রথমে ভাবল বুঝি হাত-পা ভেঙ্গে গেছে। তারপরই উঠে বসল। কি আশ্চর্য। আমি তো মরিনি! আমার পায়ের বেড়িটা শুধু ভেঙ্গে গেল। ভালই হল। বলেই উঠে ছুট দিল। ভিড় সরিয়ে একেবারে চণ্ডালদের সামনে উপস্থিত হয়ে সব কথা খুলে বলল।

চণ্ডাল দুজন সব শুনে বলল, 'স্থাবরক। তুই সত্যিকথা বল্‌চিস্?

স্থাবরক বলল, 'সত্যি বলছি। পাছে আমি সব প্রকাশ করে দিই, এই ভয়ে চিলেকোঠায় পায়ে বেড়ি দিয়ে আমাকে বেঁধে রেখে দিয়েছিল।'

ঠিক সেই সময় শকার সবে খেয়ে উঠেছে। মাংস, তিক্ত, অম্ল, শাক, সূপ, মৎস্য ইত্যাদি আকণ্ঠ খেয়ে, ভুঁড়িতে বাঁ হাত বোলাতে বোলাতে, ডান হাতে খড়্‌কে-কাঠি দিয়ে দাঁত খোঁচাতে খোঁচাতে সবে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে, তখনই ঢ্যাঁডরার আওয়াজ কানে গেল। মনটা তার উৎফুল্ল হয়ে উঠল। শত্রুর মরণ দেখতে বড় ভাল লাগে। শুনেছি নাকি যে শত্রুর মরণ দেখে, তার জন্মান্তরে চক্ষুরোগ হয় না। এবার তবে ছাদে গিয়ে ভাল করে দেখি। ভেবেই ছাদে গিয়ে দেখল স্থাবরক নেই। 'সর্বনাশ। ব্যাটা পালিয়ে গিয়ে গুপ্তকথা সব ফাঁস করে দেয়নি তো। সন্ধান করে দেখতে হচ্ছে।'

'ওরে, পথ ছাড়। পথ ছেড়ে দে।' বলতে বলতে চণ্ডালদের

কাছে এসেই শকার দেখল স্থাবরক দুচোখ আগুন নিয়ে তারদিকে তাকিয়ে আছে। তাকে দেখেই স্থাবরক চেঁচিয়ে উঠল, 'ঐ যে, উনি এসেছেন। নীচ ইতর কোথাকার। বসন্তসেনাকে মেরে সন্তুষ্ট নোস—এখন এই বন্ধুজনের কল্পতরু চারুদত্ত মহাশয়কে মারবার চেষ্টায় আছিস্।'

শকার বেশ থতমত খেয়ে গেল। কি সর্বনাশ। এই ব্যাটা স্থাবরকই তো আমার অকার্য্যের একমাত্র সাক্ষী। কেন যে ওকে ভাল করে বেঁধে রাখলাম না। ইস্। প্রকাশ্যে দেঁতো হাসি হেসে বলল, 'কে বললে একথা ? আমি রত্নকুম্ভের মত মহাত্মালোক, আমি কখনও স্ত্রী-হত্যা করি না।' বলেই স্থাবরকের একটা হাত ধরে হেঁচ্‌কা দিয়ে নিজের দিকে টেনে এনে কৌশলে নিজের হাতের আঙ্গুল থেকে একটা আংটি খুলে নিয়ে স্থাবরকের হাতে গুঁজে দিয়ে বলল, 'এই নে, এবার মিথ্যে করে বল্।'

ফল হ'ল বিপরীত। স্থাবরক আংটি তুলে ধরে চেঁচিয়ে বলল, 'মহাশয়রা সব দেখুন, দেখুন। আমাকে আবার সুবর্ণের লোভ দেখাচ্ছে।'

শকার প্রমাদ গনল। আংটিটা স্থাবরকের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'এই তো, এই তো সেই আংটি। যার জন্য ওকে আমি বন্দী করে রেখেছিলাম। শুনুন মহাশয়েরা। ও ছিল আমার সুবর্ণ ভাণ্ডারের রক্ষক। চুরি করার অপরাধে ওকে আমি খুব প্রহার করি। যদি বিশ্বাস না হয়, ওর পিঠটা একবার দেখুন।'

চণ্ডালদের একজন স্থাবরকের পিঠের কাপড় সরিয়ে দেখে বলে উঠল, 'শ্যালক মশাই ঠিকই বলেছেন। এই ব্যাটা স্থাবরক রাগের বশে আবোল তাবোল বকিছে। যা ব্যাটা, ভাগ এখান থেকে।' বলে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল তাকে।

মাটিতে পড়ে গিয়ে স্থাবরক করুণ চোখে চারুদত্তের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'ভৃত্যের এই দশা। সত্যি বললেও কেউ বিশ্বাস করে না। চারুদত্ত মহাশয়। আমার যা সাধ্য আমি করলাম।'

স্থাবরক চলে যেতেই চণ্ডালেরা দক্ষিণ শ্মশানের বধ্যভূমিতে চারুদত্তকে নিয়ে এল।

শকারও এল। ভাবল, এসেই যখন পড়েছি, চারুদত্তকে কি রকম করে বধ করে দেখাই যাক।' তারপর চণ্ডালেরা বসে আছে দেখে দাব্‌ড়ে উঠল: 'ওরে চণ্ডাল। বিলম্ব করছিস কেন? বধ করনা ওকে।'

একজন চণ্ডাল খড়্গ হাতে উঠে দাঁড়ালো। চারুদত্তের কাছে গিয়ে বলল, 'চারুদত্ত মহাশয়। আকাশে যে চন্দ্র-সূর্য্য থাকেন, তাঁদেরই যখন বিপদ উপস্থিত হয়, তখন মরণ-ভীরু মানবের তো কথাই নেই। এ সংসারে কেউ বা উঠে, আবার পড়ছে, কেউবা পড়ে আবার উঠছে। স্থির হয়ে, শান্ত হয়ে দাঁড়ান, এক কোপেই আপনাকে স্বর্গস্থ করছি।' বলে যেই সে খড়্গ তুলতে গেল, হস্তচ্যুত হয়ে খড়্গ পড়ে গেল।

'আরে, একি হল? খড়্গ পড়ে গেল আমার হাত থেকে! এরূপ যখন ঘটল, তখন মনে হয়, চারুদত্ত মহাশয় মরবেন না। ভগবতী সহ্য-শৈল বাসিনী। রক্ষা কর। চণ্ডাল কুলকে রক্ষা কর তুমি।'

সঙ্গের চণ্ডাল তাকে ধমক দিয়ে উঠল। 'যেরূপ আদেশ পাওয়া গেছে, সেইরূপ কাজ করা যাক। শূল প্রস্তুত করেছি। চারুদত্তকে ধরে শূলে বসিয়ে দিই এস।'



ওদিকে যে বৌদ্ধ ভিক্ষুর দয়ায় এবং শুশ্রূষায় অচেতন বসন্তসেনা প্রাণ ফিরে পেয়েছিল, একটু সুস্থ হতেই সে ভিক্ষুককে তাগাদা দিয়ে চারুদত্ত মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য রওনা হয়েছিল। ভিক্ষুর আশ্রম উজ্জয়িনী থেকে কিছুটা দূরেই অবস্থিত ছিল। তবু, দ্রুত-পদে তারা নগরী মধ্যে প্রবেশ করল। নগরীতে প্রবেশ করেই বসন্তসেনার বুকের ভেতরটা কি এক অমঙ্গল আশঙ্কায় থর্‌থর্‌ করে কেঁপে উঠল। ভিক্ষুও আশ্চর্য্য হয়ে ভাবল এমন প্রাণবন্ত ননরীর আজ এমন হতশ্রী চেহারা কেন? লোকজন সব গেল কোথায় ঘরবাড়ী অরক্ষিত ফেলে রেখে? তখনই দূরের রাজপথ থেকে কোলাহলের শব্দ তার কানে এল। রাজপথে ভয়ানক লোকের ভীড়। ভিক্ষু এগিয়ে গিয়ে একজনকে জিজ্ঞেস করেই ভীষণ আশঙ্কায় অস্থির হয়ে বসন্তসেনাকে দ্রুত সব কথা বলে ছুটতে ছুটতে বলল, 'দেবী আপনিও শীঘ্র আসুন! আমি ছুটে গিয়ে দেখি শেষ রক্ষা করতে পারি কিনা।'

ভিক্ষু বধ্যভূমি লক্ষ্য করে ছুট দিল। বসন্তসেনাও দুর্বল দেহে যতটা দ্রুত পারল, এগোতে লাগল।

চণ্ডাল দুজন তখন চারুদত্তকে ধরে শূলে চড়াতে উদ্যত হয়েছে, তখনই দূর থেকে সেই দৃশ্য দেখে ভিক্ষুক চিৎকার করে বলে উঠল—'ক্ষান্ত হোন—ক্ষান্ত হোন, এই অকার্য্য করবেন না।' বলতে বলতে ভিক্ষু এগিয়ে এসে চণ্ডালদের বলল, 'চারুদত্ত হত্যাকারী নন্‌, এই শকারই বসন্তসেনাকে হত্যা করতে চেয়েছিল।'

'তবে রে শয়তান ভিক্ষু, দেখাচ্ছি তোকে মজা,' বলে শকার

ভিক্ষুর দিকে তেড়ে এল।

ভিক্ষু এতটুকু বিচলিত না হয়ে ধমক দিয়ে বলল, 'থামো মূর্খ! ওই দিকে তাকিয়ে দেখো একবার।'

মুখ ফিরিয়ে সকলেই দেখল গৈরিকবেশ ধারিণী, দেবকন্যার মত রূপসী, ব্রহ্মচারিণী বসন্তসেনা এগিয়ে আসছে। পথশ্রমে ক্লান্ত, কিন্তু দয়িতের দর্শনে উৎফুল্ল বসন্তসেনা ছুটে এসে চারুদত্তের পদ-প্রান্তে নত হয়ে বসে পড়ল।

তাই দেখে সত্রাসে শকার মনে মনে বলে উঠল: কি সর্বনাশ! এই গর্ভদাসীটাকে কে আবার বাঁচিয়ে দিলে? এইবার আমার প্রাণটা গেল দেখচি! আমি তবে পালাই। যেমন ভাবা, অমনি উল্টো দিকে ফিরে দৌড় দিল শকার!

চণ্ডাল দুজন এগিয়ে এসে ভাল করে বসন্তসেনাকে দেখে বলে উঠল, 'তাইতো! বসন্তসেনাই বটে।' তারপর দুজনেই দুজনকে বলে উঠল, 'চল্, এই ঘটনার কথা রাজা পালককে নিবেদন করি। তিনি আজ্ঞা করেছিলেন, বসন্তসেনাকে যে হত্যা করেছে, তারই প্রাণদণ্ড হবে। এখন তাহলে সেই রাষ্ট্রীয় শ্যালককেই খুঁজে বার করি চল্!' বলে চণ্ডাল দুজন চলে গেল।

চারুদত্ত এতক্ষণ কি এক ঘোরের মধ্যে যেন স্থির হয়েই দাঁড়িয়ে-ছিলেন। কোনও কিছুই যেন তার বোধগম্য হচ্ছিল না। চণ্ডালরা চলে যেতে যেন তাঁর চোখের সামনে থেকে, মাথার ভেতর থেকে ঘোর কেটে যেতে লাগল। বসন্তসেনার হাতের স্পর্শসুখে তাঁর চেতনার ওপর থেকে কালো মেঘ সরে গেল। ঝুঁকে পড়ে নিরীক্ষণ করে তিনি সহর্ষে বলে উঠলেন, 'বসন্তসেনা! তুমি!'

'হ্যাঁ, নাথ!' বসন্তসেনা লজ্জারুণ মুখে বলে ওঠে। তারপর ঈষৎ অনুযোগের স্বরে বলে, 'আমার প্রতি এত সদয় হয়ে তুমি কি করতে যাচ্ছিলে বল দিকি?'

বসন্তসেনার অনুযোগের কি উত্তর দেবেন চারুদত্ত। তিনি নির্নিমেষ মুগ্ধ দৃষ্টিতে বসন্তসেনার দেবদুর্লভ মুখের দিকে তাকিয়ে

রইলেন। মনের মধ্যে তাঁর অবিরাম কথার মালা গাঁথা চলতে লাগল।···আমাকে মৃত্যুমুখে দেখে সহসা আবির্ভূত হয়েছে আমার সঞ্জীবনী বিদ্যা-বসন্তসেনা, আহা, অশ্রুর ধারায় ওর উন্নত, সুডৌল পয়োধরযুগলের ওপর গৈরিক বসন সিক্ত হয়ে গিয়েছে। সহসা এগিয়ে এসে তিনি বসন্তসেনার দুই অংসে দুটি হাত রেখে আবেগ থরথর স্বরে বলে উঠলেন, 'প্রিয়ে বসন্তসেনা! তোমারই কারণে এই দেহের নিধন হ'তে যাচ্ছিল, তোমার দ্বারাই শেষে হলো নিবারণ। আশ্চর্য্য প্রভাব এই প্রিয়-সঙ্গমের! নইলে, মৃতের কি কখনও পুনঃ প্রাণলাভ হয়?'

বসন্তসেনা লজ্জারুণ মুখে চারুদত্তের দেহের সঙ্গে ঘন হয়ে এসে তাঁর প্রশস্ত বক্ষে মুখ লুকালো। চারুদত্ত এতক্ষণে যেন নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ফিরে পেয়েছেন। বসন্তসেনাকে মৃদু আলিঙ্গনে বেঁধে তিনি রসিকতাচ্ছলে বলে উঠলেন, 'দেখ প্রিয়ে, আমার পরণে এই চারু রক্তবস্ত্র আর রক্তজবার মালা, যা বধ্যজনকে পরানো হয়, এখন যেন প্রিয়া-সম্মিলনে যাত্রারত বিবাহের বরবেশ হয়ে শোভা পাচ্ছে; আর একটু আগে যে বধ্যজন দুন্দুভির ধ্বনি হচ্ছিল, আমার কানে তা বিবাহ-উৎসব বাদ্যের মত বাজছিলো।' বলে মুখ ফেরাতেই বৌদ্ধ ভিক্ষুর দিকে তাঁর দৃষ্টি পড়ল। চারুদত্ত বসন্তসেনাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার প্রাণ রক্ষাকারী এই ভিক্ষু কে?'

ভিক্ষুক একথা শুনে করজোড়ে বলল, 'মহাশয় আমাকে চিনতে পারছেন না? আমি আপনার সেই চরণ সেবক সংবাহক। আমি নানা কুসঙ্গে পড়ে নষ্ট হয়ে যেতে বসেছিলাম। জুয়ারী মানুষের সংসর্গে পড়ে গেছলাম। তখন এই ঠাকরুণই নিজ অলঙ্কার পণ দিয়ে আমাকে ছাড়িয়ে আনেন। তারপরই আমি সব ত্যাগ করে বৌদ্ধ শ্রমনক হয়েছি।'

তখনই এই দিকে এক ব্যক্তি ছুটে আসছে দেখে সকলেই ফিরে তাকায়। লোকটি কাছে এসে প্রণাম করে বলে, আর্য্য চারুদত্তের জয় হোক। সঙ্গে বসন্তসেনাও আছেন দেখছি! আমাদের প্রভুর

মনোরথ তবে এইবার সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হবে।'

চারুদত্ত ঈষৎ বিস্মিত স্বরে প্রশ্ন করলেন, 'কে তুমি?'

বিনীত স্বরে লোকটি বলে, 'অধমের নাম শর্বিলক। আমি আমাদের নতুন রাজা আর্যকের পক্ষ থেকে আপনাকে একটি সুসংবাদ দিচ্ছি। রাজা পালককে নিহত করে আর্যক উজ্জয়িনীর সিংহাসনে আরূঢ় হয়েছেন। রাজ্যে অভিষিক্ত হওয়ামাত্রই আপনার সুহৃদ আর্যক উজ্জয়িনীর বেনা নদীতটস্থ কুশাবতী রাজ্যটি আপনাকে দান করেছেন। অতএব সুহৃদের এই প্রথম প্রণয়-দান আপনি গ্রহণ করুন। তারপর সেই পাপী রাষ্ট্রীয় শ্যালকের বিচার করুন।' বলেই শর্বিলক মুখ ফিরিয়ে আদেশ করল, 'ওরে, তোরা ঐ পাপীটাকে এখানে নিয়ে আয়!'

শর্বিলকের আদেশে পিছমোড়া করে বাঁধা শকারকে ধাক্কা দিতে দিতে সামনে নিয়ে এল কজন সৈনিক।

শকারের আর বুঝতে বাকী ছিল না যে এখন চারুদত্তই তার ত্রাণকর্তা। সে একেবারে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে কাতর প্রার্থনার স্বরে বলে উঠল, 'আপনি শরণাগত বৎসল! আমাকে রক্ষা করুন!'

চারুদত্ত অনুকম্পার স্বরে শকারের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ভয় নাই, ভয় নাই।' তারপর শর্বিলকের দিকে তাকালেন!

শর্বিলক তৎক্ষণাৎ বলল, 'আর্য চারুদত্ত! আপনিই বলুন, এই পাপীকে কি শাস্তি দেওয়া যাবে? কুকুর দিয়ে খাওয়াব, না শূলে আরোপণ করব, অথবা করাত দিয়ে কাটব?'

ইতিমধ্যে সমবেত জনতা থেকে আওয়াজ হলো: 'বধ কর্, বধ কর্—পাতকী এখনও কেন জীবিত আছে?'

বসন্তসেনাও আর নিজেকে সংযত রাখতে পারল না। চারুদত্তের গলা থেকে জবাফুলের মালাটা খুলে নিয়ে শকারের গায়ের ওপর নিক্ষেপ করল।

শকার একেবারে পোষা কুকুরের মত কেঁউ কেঁউ করে বলে উঠল, 'বসন্তসেনা! রাগ কোরো না মা! প্রসন্ন হও! আমাকে রক্ষা কর।'

চারুদত্ত একবার জনমণ্ডলীর দিকে তারপর শর্বিলকের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর স্বরে বললেন: 'আমি যা বলব, তাই কি করা হবে?'

'অবশ্যই।' শর্বিলক বলল।

'তাই যদি হয়, শীঘ্র একে—

'বধ করা হোক?'

'না, না, ছেড়ে দেওয়া হোক।'

চারুদত্তের একথায় শর্বিলক ও সমগ্র জনমণ্ডলী বলে উঠল, 'না, না, একে কুকুর দিয়ে খাওয়ানো হোক!'

চারুদত্ত ধীর, কিন্তু দৃঢ় স্বরে বললেন: 'অপরাধী শত্রু শরণাগত হয়ে যদি পায়ে পড়ে, তবে তাকে অস্ত্র বা অন্য উপায়ে বধ করা উচিত নয়। একে পূর্বের মতই পুষ্পকরণ্ডক উদ্যানের রক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করা হলো।'

হতাশ কণ্ঠে শকার বলে উঠল: 'সে কি! আমি মালী হবো?'

শর্বিলক তরোয়ালের অগ্রভাগ শকারের গলায় ঠেকিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'হ্যাঁ, তাই হবে। যদি বাঁচতে চাও!'

তখনই একটা সোরগোল উঠল। চন্দনক নামে সেই বিদ্রোহী সৈনিক হাঁফাতে হাঁফাতে এসে বলল, 'আর্য চারুদত্ত! শীঘ্র চলুন! ধূতা দেবী অগ্নিকুণ্ডে জীবন বিসর্জন দিতে যাচ্ছেন।'

চারুদত্ত অস্থির হয়ে পড়লেন। বসন্তসেনা তাঁকে ধরে ফেলে বলল, 'আর্য, ধৈর্য্য ধরুন! শীঘ্র চলুন! অধীর হলে অনর্থ হবে।'

সকলেই ছুটে চলল।

চারুদত্ত ও বসন্তসেনার পাশে পায়ে ছুটতে ছুটতেই চন্দনক বলতে লাগল: 'আমি ধুতা দেবীকে বললাম, 'ঠাকরুণ, হতাশ হবেন না। চারুদত্ত মহাশয় বেঁচে আছেন।' কিন্তু তিনি যেরূপ দুঃখে অভিভূত, তাতে কেই বা শোনে—কেই বা বিশ্বাস করে? তিনি কেবল বললেন, 'আর্যপুত্রের অমঙ্গল শোনার চেয়ে পাপাচরণও ভাল।' তখন বালক রোহসেন মাতার বস্ত্রাঞ্চল আকর্ষণ করে বলল, 'মা, তুমি গেলে আমাকে কে দেখবে?'

চারুদত্ত চন্দনকের এইসব কথা শুনছেন আর তাঁর বুকের মধ্যে আবেগের সমুদ্র উত্তাল হয়ে উঠছে। তখন কিছু দূরে লোক-জনের ভীড় দেখা গেল। চারুদত্ত এবং চন্দনক সর্বাগ্রে ছুটে গেল।

চিতা সাজানো হয়েছে। কিন্তু ধূতা দেবী কিছুতেই পুত্র রোহ-সেনের হাত থেকে তাঁর বস্ত্রাঞ্চলের বাঁধন ছাড়িয়ে নিতে পারছেন না।

মৈত্রেয় বলছে, 'স্বামীর অনুমতি ভিন্ন চিতায় আত্মাহুতি দিলে ব্রাহ্মণীর পাপ হয়।'

ধূতা দেবী মৈত্রেয়র কথায় কর্ণপাত না করে পুত্র রোহসেনকে আদর করে বললেন, 'ওরে বাছা, আমি গেলে তোর পিতা কি তোকে দেখবেন না?'

ততক্ষণে চারুদত্ত ভীড় ঠেলে মধ্যিখানে ঢুকে পড়েছেন। কথাগুলি শুনেই তিনি বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ, বাছাকে আমিই দেখব।' বলে এগিয়ে এসে রোহসেনকে আপন বক্ষে তুলে নিয়ে ধূতা দেবীকে বললেন, 'আর তোমাকেও দেখব।'

মৈত্রেয় চারুদত্তকে দেখেই একেবারে হৈ হৈ করে উঠল: 'ওগো! এই চোখে প্রিয় সখাকে যে আবার দেখচি। ওঃ! সতীর কি প্রভাব! অগ্নিপ্রবেশের চেষ্টা করেও প্রিয়-সম্মিলন ঘটে গেল!'

দাসী রদনিকা ছুটে এসে চারুদত্তের পদতলে প্রণতঃ হল।

চারুদত্ত সস্নেহে তার পিঠে হাত রেখে বললেন, 'রদনিকে! ওঠো মা!'

এই ফাঁকে বসন্তসেনা এগিয়ে গিয়ে ধূতা দেবীকে প্রণাম করল। ধূতা দেবী তাঁকে তুলে ধরে চিবুকের নীচে হাত রেখে চুম্বন করলেন। বললেন: 'এস বোন্, এসো! সুখে আছ তো?'

বসন্তসেনা সলজ্জ স্বরে বলল, 'এখনই সুখী হলাম।'

তখন শর্বিলক এগিয়ে এসে বলল: চারুদত্ত মহাশয়!—এইবার আপনার সুহৃদ রাজা আর্যকের শেষ আদেশটি সর্বসমক্ষে শুনিয়ে দিই। প্রথমে বসন্তসেনার প্রতি রাজা আর্যকের নিবেদন, ঠাকরুণ বসন্তসেনা! রাজা পরিতুষ্ট হয়ে আপনার প্রতি 'বধূ' শব্দ প্রয়োগ

করতে আদেশ করেছেন।'

বসন্তসেনা সলজ্জ নতমস্তকে বলল, 'মহাশয়! কৃতার্থ হলাম।'

তখন শর্বিলক তার কোমরে গোঁজা উত্তরীয়টি খুলে চারুদত্তের হাতে দিয়ে বলল, 'মহাশয়! আর্যকের অনুরোধ অনুযায়ী আপনি বধূবরণ করুন!'

চারুদত্ত উত্তরীয় দিয়ে বসন্তসেনাকে অবগুণ্ঠিতা করে আপন বধূরূপে গ্রহণ করলেন।

সমবেত জনতা আনন্দে হর্ষধ্বনি করে উঠল।

তখন শর্বিলক চারুদত্তকে বলল, 'মহাশয়! আপনার আর যদি কিছু আকাঙ্ক্ষিত থাকে বলুন! রাজা আর্যক তা পূরণ করবেন!'

চারুদত্ত বিনীত স্বরে আর্যকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বললেন, 'আর আমার আকাঙ্ক্ষিত কিছু নেই। আমি অপবাদমুক্ত। পদানত শত্রুকে ক্ষমা করেছি। সুহৃদ আর্যক দেশকে অপশাসনের হাত থেকে উদ্ধার করে ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছেন। আমার প্রিয়াকে আমি লাভ করেছি। আর আমার প্রিয় বাসনা কি থাকতে পারে। কেবল এই প্রার্থনা করি: আমাদের আদরের, ভালবাসার এই দেশ ফুলে ফুলে শস্যপূর্ণা হোক, গাভী হোক দুগ্ধবতী, ঠিক সময়ে মেঘ ঢালুক বারিধারা। আপামর জনগণের হৃদয় হরষিত করে মধুর পবন বহে যাক। সাধুগণ লক্ষ্মীবন্ত হোন্; বিপ্রগণ সঠিক পথ নির্দেশ করে সমাজের অগ্রগমনে সহায়তা করুন; আর রাজাগণ সংযত-রিপু, ধর্ম্মপরায়ণ হয়ে পৃথিবী পালন করুন!'

।। সমাপ্ত ।।